স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ২৯ এপ্রিল, ২০২৪।। ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

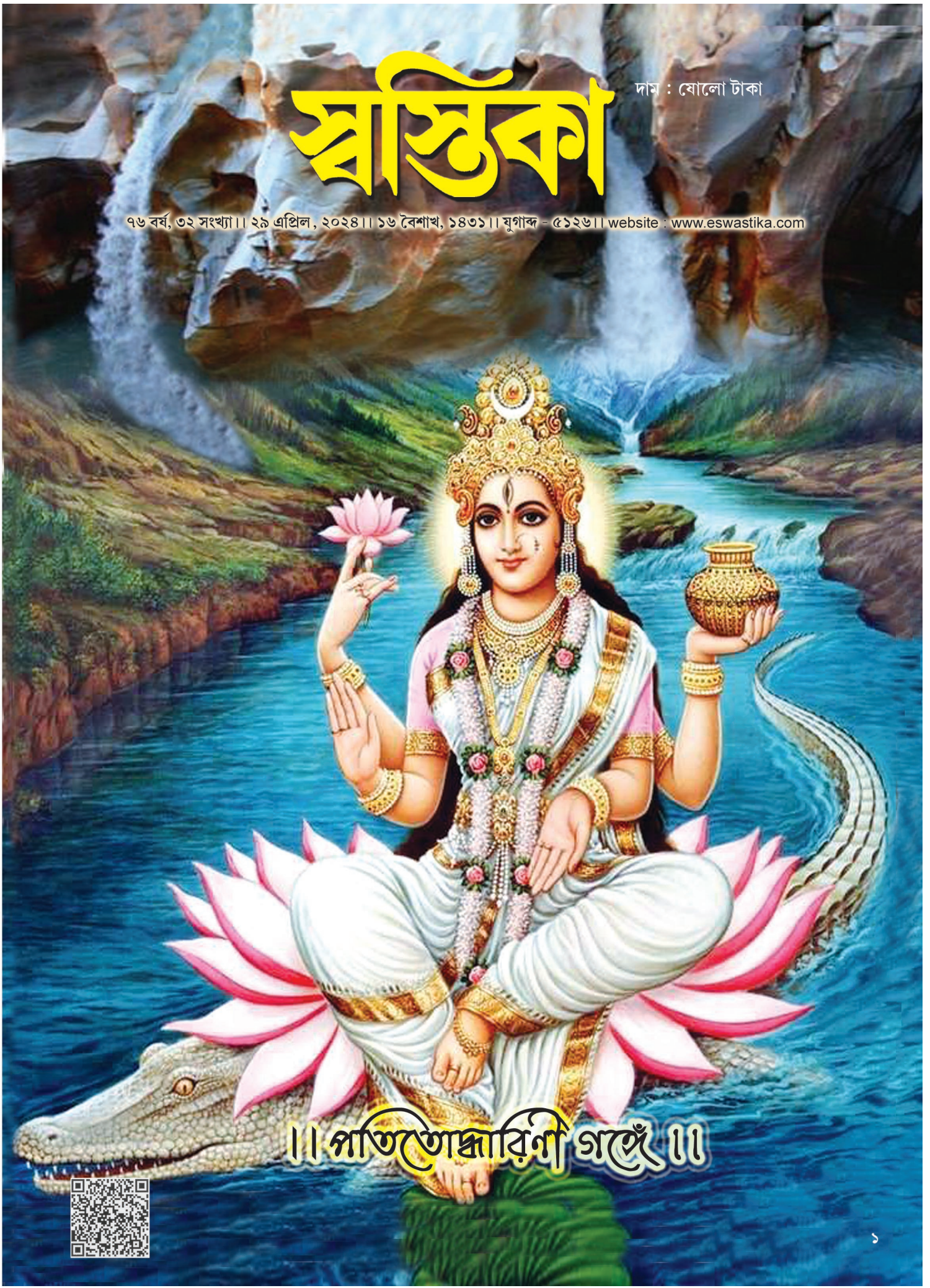

।। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ।।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৯ এপ্রিল - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

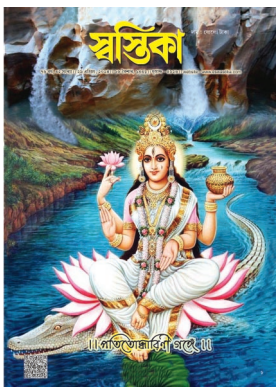

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

কানা ছেলে পদ্মলোচন আর কুঁজো চিত হতে চায়, বাম-কং উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

কেনা চাকরি, বেচা চাকরি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্পপত্র আগামী ভারত নির্মণের রূপরেখা ☐ প্রদীপ মারিক ☐ ৮

পাকিস্তানকে সতর্ক করলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী : জওয়ানদের কণ্ঠে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধেছে গঙ্গা ☐ চঞ্চল কুমার ঘোষ ☐ ১১

গঙ্গামায়ের নির্দোষ সন্তান ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ১৩

গঙ্গাধর মহারাজের গঙ্গাপ্রীতি ☐ অসীমলাল মুখার্জি ☐ ১৪

দূষণ রুখতে ভারতীয় নদীগুলোর সংস্কার অত্যন্ত জরুরি ☐ তারক সাহা ☐ ১৬

গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি এবং রাজনীতি ☐ দেবজিৎ সরকার ☐ ১৭

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় নিয়ে ভাবনা ☐ সঞ্জয় বাড়ুই ☐ ২০

ডাকটিকিটে মা গঙ্গা ও ডাকবিভাগের গঙ্গাজল প্রকল্প ☐ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ☐ ২৩

গঙ্গার উৎস সন্ধানে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ২৪

গঙ্গার দূষণ এবং তার প্রতিকার ☐ শাওন ব্যানার্জী ☐ ২৫

হিন্দু জীবনচর্যায় রয়েছে গঙ্গাস্নানের রীতি ও পরম্পরা ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৬

বঙ্গ সাহিত্যে গঙ্গা ☐ মিলন খামারিয়া ☐ ২৮

হিন্দুর জীবনবেদ গঙ্গা—সর্বপাপহারিণী ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গাবিধৌত সমভূমিরই উত্তরাধিকার ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩৬

কলকাতায় গঙ্গার ঘাট ☐ অভিমন্যু গুহ ☐ ৩৮

গঙ্গারপাড়ের একটি যুদ্ধের কথা ☐ হীরক কর ☐ ৪৩

নির্বাচনী বন্ড যদি অসাংবিধানিক হয় তাহলে সুষ্ঠু ব্যবস্থা কী? ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষাল ☐ ৪৭

বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসে গুজরাটের মিশন লাইফ এক অগ্রণী পদক্ষেপ ☐ সৌমিত্র সেন ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে
৬ মে,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৬ মে,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব, রচনা, কাব্য ও সাহিত্যকর্মের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে দেশাত্মবোধ। এই দেশাত্মবোধই হলো তাঁর জাতীয়তাবোধ। ইংরেজি ন্যাশনালিজমের থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবোধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহিনী

ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহ গঙ্গানদী। ইহা ভারতের জীবন রেখাও। হিমালয়ের গোমুখ হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গা ও তাহার শাখানদীগুলি সমগ্র উত্তর ভারতকে শস্যশ্যামলা করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। গঙ্গা স্বর্গের দেবী, মানব কল্যাণে নদীরূপে তাঁহার মর্ত্যে অবতরণ। তাই দেবতারাও গঙ্গার স্তবগান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মুনি-ঋষি-সাধক, কবি-সাহিত্যিক সকলেই গঙ্গার স্তবগীতে মুখর হইয়াছেন। দেশের অতি দক্ষিণ প্রান্তের মানুষ হইয়াও আদি শঙ্কারাচার্য গঙ্গার স্তবগীতে বলিয়াছেন— 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে।' বঙ্গদেশের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গাহিয়াছেন— 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।' হিন্দুর নিকট গঙ্গাই সারাৎসার। জনমেও তাহার গঙ্গাজল চাই, মরণেও গঙ্গাজল। হিন্দুর বিশ্বাস, গঙ্গাজলের স্পর্শে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে। তাই বেদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত সর্বত্র গঙ্গা মাহাত্ম্যের ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষের মানুষের নিকট গঙ্গা ও জল সমার্থক হইয়া গিয়াছে। যেকোনো জলকেই হিন্দুরা গঙ্গা বলিয়া মনে করে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিকেও গঙ্গা জ্ঞানে পূজা করা হয়। গোদাবরী নদীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হইয়াছে। কাবেরী নদীকেও গঙ্গা বলা হইয়া থাকে। গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরীর অনেক শাখানদীকে গঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তবু ভাগীরথী গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্য সারা দেশের মানুষের কী আকুলতা। দক্ষিণ ভারত হইতে আগত ট্রেনগুলি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাইলে এই আকুলতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অগণিত সাধারণ মানুষ ট্রেন হইতে নামিয়াই স্টেশন সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়া আসিয়া স্নান সারিয়া, পূজা করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন। হিন্দুর জীবনে গঙ্গা যে স্বর্গের ঠিকানা!

সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা ইতিহাসেরও সাক্ষী। একসময় পূর্ব ভারতের গঙ্গা অববাহিকায় 'গঙ্গাহৃদয়' নামে এক শক্তিশালী গণরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। আলেকজান্ডার ভারত অভিযানকালে দূতের মুখে এই শক্তিসঙ্ঘের নাম শুনিয়াছিলেন। তাহার পরাক্রম ও অমিত সৈন্যবলের কথা শুনিয়া আলেকজান্ডার আর পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার সাহস দেখান নাই। বহু গ্রিক ঐতিহাসিক লেখকের বর্ণনায় এই গঙ্গাহৃদয় মতান্তরে 'গঙ্গারিডাই' শক্তিসঙ্ঘের উল্লেখ রহিয়াছে।। তাহাদের বর্ণনায় 'গঙ্গা' নামের এক বন্দর-নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের মকরবাহিনী গঙ্গার চিত্র সংবলিত মুদ্রার কথা তো ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই অবগত আছেন। বিশ্বের মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র অতি পবিত্র নদী। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে, গঙ্গাজল দীর্ঘদিন কোনো পাত্রে রাখিলেও তাহা নষ্ট হয় না। গবেষণা অনুসারে, গঙ্গার উৎসস্থলে কোথাও ক্রোমিয়াম ও থোরিয়াম রহিয়াছে। এই উপাদানগুলিই গঙ্গার জলকে জীবাণুমুক্ত করিয়া রাখে। ইহা ব্যতীত গঙ্গাজলে উপকারী ভাইরাস ব্যাকটিরিয়োফাজ রহিয়াছে। গবেষকদের মতে, গঙ্গানদীতে এগারোশত প্রকারের ব্যাকটিরিয়োফাজ রহিয়াছে। উহারা ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করিয়া গঙ্গার জলকে শুদ্ধ করিয়া রাখে। গবেষণায় ইহাও জানা গিয়াছে যে, বিশ্বের যে কোনো নদীর তুলনায় গঙ্গাজলে পঁচিশেরও অধিক অক্সিজেন উপাদান রহিয়াছে। মুঘল বাদশা আকবরও নাকি প্রতিদিন গঙ্গাজল পান করিতেন। তিনি গঙ্গাজলকে 'আব-এ-হায়াত' অর্থাৎ অমরত্বের জল বলিতেন। গঙ্গানদী ও গঙ্গাজলকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংকৃতি,ইতিহাস-ভূগোল, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়াছে।

এতদসত্ত্বেও মানুষেরই হঠকারিতায় এহেন পবিত্র নদী ক্রমশ দূষিত হইয়া পড়িতেছে। গঙ্গানদী কলুষিত হইয়া পড়িলে ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন যে স্তব্ধ হইয়া পড়িবে তাহা আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বুঝিতে পারিতেছে না। স্বার্থ ও অজ্ঞানতার কারণে মানুষ ক্রমশ গঙ্গাকে দূষিত করিয়ে ফেলিতেছে। দূষণরোধে সরকার নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৮৬ সালে 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' এবং বর্তমান ভারত সরকারের 'নমামি গঙ্গে' উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা সমগ্র-সহ নানান বেসরকারি সংস্থাও এইক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতেছে। এত কিছুর পরেও ভারতের শীর্ষ আদালতকে বলিতে শোনা গিয়াছে যে,মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহা হইলে দুইশত বৎসরেও গঙ্গাশোধন হইবে না। ইহা অতীব চিন্তার কথা। এই সাবধানবাণীকে মনে রাখিয়া ভারতবর্ষের জীবনরেখাকে চিরপ্রবাহিত ও নিষ্কলুষ রাখিবার জন্য ভারত সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

জ্যেষ্ঠত্বং জন্মনা নৈব গুণৈর্জ্যেষ্ঠত্বমুচ্যতে।
গুণাৎ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধং দধি ঘৃতং ক্রমাৎ।।

মানুষের মহানতা জন্ম থেকে আসে না। মহানতা মানুষের গুণ থেকে আসে। যেমন দুধ ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়ে দধি হয় এবং দধি থেকে ক্রমশ ঘি তৈরি হয়।

কানা ছেলে পদ্মলোচন আর কুঁজো চিত হতে চায়

বাম-কং উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আমার অনুপ্রেরণা এক বিখ্যাত সাংবাদিক ব্রিগেডের সভায় বলেছিলেন, '২১টি দল মিলে আপনারা যেরকম ঝগড়া করছেন তাতে না রহেগি বাঁশ না বজেগি বাঁশুরি'— বাঁশও থাকবে না আর বাঁশিও বাজবে না'। ২০১৯-এ ৩০৩ আসন পায় বিজেপি। জোট ধ্বংস হয়ে যায়। ইদানীং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। অত্যন্ত লজ্জার নিম্নরুচি আর কুরুচিকর ভাষা বলছেন। মনে হয় হেরে যাওয়ার ভয় তাঁর পিছু নিয়েছে। তাই আনতাবড়ি বকছেন যে বিজেপি ২০০ আর কংগ্রেস ৪০ আসন পেরোবে না। কে পেরোবে? তৃণমূল না সিপিএম? মাজা ভাঙা সিপিএম এবারের ভোটে ৫০ আসনে লড়ছে। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে কম। আর তৃণমূল মাত্র ৪২। সিপিএমের জন্ম ১৯৬৪ আর তৃণমূল ১৯৯৮। ভোটের ময়দানে এখন তারা কাছাকাছি এসে গিয়েছে। সারা দেশে কংগ্রেস ৩২০ (আগের বারের তুলনায় প্রায় ১০০ কম) আর বিজেপি ৪৪৫ আসনে লড়ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ক। তাই বিজেপির ৪০০ পেরিয়ে যাওয়ার দাবিকে ৪৪০ ভোল্ট শক দেওয়ার আজগুবি দাবি তুলছেন। সিপিএমের এখন অস্তিত্ব সংকট (৬ শতাংশ ভোট বাঁচবে কি?)। তাদের এখানকার স্বাভাবিক মিত্র কেরালায় চরম শত্রু। উভয়ের সুবিধাবাদের রাজনীতি নতুন নয়।

তৃণমূলের মতোই সিপিএম মানুষকে ধোঁকা দেয়। এখন তাদের কোনো ক্ষমতাও নেই। থাকলে কী হতো বলা মুশকিল। তৃণমূলের বড়ো সমস্যা এবার তাদের দল বাঁচানো। ছাব্বিশ জন নেতা মন্ত্রী গারদে রয়েছে। ভোটের ফল বেরোনোর আগেই মানুষের ধারণা হয়েছে— (১) বিজেপি এক নম্বর দল হবে। (২) তৃণমূল ধ্বংস হবে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নিন্দা করে মমতা বলতেন অত্যাচারী চেসেস্কুর দশা হবে বসুর। মাথা খসে পড়বে। মমতা ক্ষমতায় আসার আগেই সিপিএম তার মাথা খসিয়ে দেয়। যুবফ্রন্টে তৈরি এক নেতাকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয় আর তাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে। ১৯৯৬-এ জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে খুন করে তাঁর দল সিপিএম। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আর্নস্ট ফিশার বলেছিলেন, 'মাতাল আর কমিউনিস্টকে যুক্তিপূর্ণ কিছু বোঝাতে যাবেন না'। কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই। কিন্তু চোরকে চোর আর ডাকাতকে ডাকাত বলতে হয়। কারণটা নৈতিক। রাজ্যে রাজনৈতিক মহাশূন্যে চলে যাওয়া সিপিএম আর কংগ্রেস জমি খুঁজতে বেরিয়েছে। এবারের ভোটে তারা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর।

২০১৯-এ সিপিএম ৬.৩ আর কংগ্রেস ৫.৭ শতাংশ ভোট পায়। ৫০ বছরে বিদেশি বামেরা সারা দেশে সর্বোচ্চ ৫.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এখন তা কমে ১.৭৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এবারের ৫০ আসনের মধ্যে কেবল এ রাজ্য থেকেই তারা ২২টিতে লড়ছে। সিপিএম আর কংগ্রেসের জোট সদা বায়বীয়। কংগ্রেস সমর্থকরা কোনোদিন সিপিএমকে ভোট দেয় না। তাই সিপিএমের উত্তরীয় আর নামাবলী গায়ে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর প্রচার দৃষ্টিকটু লাগে। ২০১৯-এর ব্রিগেডে মোদী বিরোধী সভা থেকে নেমে যেতে চেয়েছিলেন অধীরবাবু।

> **লোকে শখ করে কানা ছেলের নাম রাখে পদ্মলোচন। আর কুঁজো চিত হয়ে শুতে চায়। এ রাজ্যে বাম-কংগ্রেস হলো তাই।**

সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম তাঁকে জাপটে ধরে আটকে দেন। সেই সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার করছেন অধীর। রাজ্যের ৪২-এর মধ্যে আনুমানিক ১৯ আসনে বাম আর কংগ্রেস ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর বা ভারসাম্য রক্ষাকারী।

তবে তা কেবল নাম কা ওয়াস্তে। ধারে ভারে তারা কোথাও নেই। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে ১২৪ আসনের মধ্যে বামেদের ১১৪ আসনে জমানত জব্দ হয়ে যায়। কংগ্রেসের সবেধন নীলমণি অধীরবাবু (বহরমপুর) আর ডালুবাবু (আবু হাসেম খান) (মালদা দক্ষিণ)। আমার ধারণা দুটি আসন এবার টলমল। আর বামেদের তো করুণ দশা। কোথায় ইঁট পাতবে বুঝতেই পারছে না।

বাম-কংগ্রেসের বোঝা দরকার তারা হলো সেই যুদ্ধে যাওয়া ঘোড়া যে আর কোনোদিন ঘরে ফিরবে না। লোকে শখ করে কানা ছেলের নাম রাখে পদ্মলোচন। আর কুঁজো চিত হয়ে শুতে চায়। এ রাজ্যে বাম-কংগ্রেস হলো তাই। রাজ্যের মানুষ এবারও হয়তো তাদের 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' করে প্রত্যাখ্যান করবে। হয়তো তাদের ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তৃণমূল ধ্বংসের বীজ। এবারের ভোটে সেটাই করবেন এ রাজ্যের মানুষ। □

কেনা চাকরি, বেচা চাকরি

সর্বহারাযু দিদি,

ভয় করছে দিদি, ভয় করছে। আপনি যেমন ভয়ে প্রকাশ্য জনসভা থেকে বিজেপি নেতাদের নামের সঙ্গে অশ্লীল শব্দ বলে ফেলছেন তেমনটা আমি করছি না বটে, তবে ঘাবড়ে যাচ্ছি দিদি, ঘাবড়ে যাচ্ছি। কলকাতা হাইকোর্টে যা রায় দিয়ে দিয়েছে তার পরে চিন্তা আর চিন্তা। যে কোনওদিন আপনাকে না তলব করে সিবিআই। ওদের তো কিছু করারও নেই। কোর্টই বলে দিয়েছে মন্ত্রীসভার সবাইকে তলব করা যাবে। আর যাঁরা চাকরি কিনেছেন তাঁদের চাকরি বহাল রাখতে অতিরিক্ত পদ তৈরির বুদ্ধি যে আপনার তা আর কে না জানে! আমি কিন্তু দিদি, সে দিনই প্রমাদ গুনেছিলাম আমি। মনে হয়েছিল, এটা তো দুর্নীতি চাপা দিতে নতুন দুর্নীতি।

কিন্তু আপনি ঠিক ম্যানেজ করে নেবেন ভেবে চিন্তামুক্ত ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোর্ট যা বলল তার পরে তো দিদি মাথাই কাজ করছে না। নিয়োগ মামলার রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট ২৫, ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে। এসএসসিতে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ সামনে আসার পরে অতিরিক্ত পদ (সুপার নিউমেরারি পদ) তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় নবান্ন। আপনার সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। হাইকোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে, যাঁরা অতিরিক্ত পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রয়োজনে ওই ব্যক্তিদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

চিন্তাটা এখানেই। মন্ত্রীসভা মানে সবার উপরে আপনি। সেই সঙ্গে সেদিন প্রভাবশালী মন্ত্রীরা সকলেই ছিলেন। ইতিমধ্যেই সেই সিদ্ধান্তের নথি প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এখন আমার প্রশ্ন, বিরোধীরা যদি এমনটা বলে যে, ২০২২ সালের ৫ মে ক্যাবিনেট বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে সিবিআই কাস্টডিতে নেওয়া উচিত, তবে তো সেটা অন্যায় দাবি হবে না।

আপনি অবশ্য সোজা কথায় সব মিথ্যে বলে দিয়েছেন। আদালত রায় ঘোষণার পরেই রায়গঞ্জের সভা থেকে আপনি বলেছেন, 'এটা বেআইনি অর্ডার। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি।' বিনীত প্রশ্ন দিদি, হাইকোর্টের রায়কে কি 'বেআইনি' বলা যায়? সেই সঙ্গে আপনি চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'যাঁদের চাকরি যাওয়ার কথা বলেছে, তাঁদের বলছি, আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি। চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না। কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না।' কী বলছেন দিদি? হাইকোর্ট যাঁদের চাকরি বেআইনি বলছে আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁদেরই পাশে থাকবেন? আপনি এটা বলার পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কিছু কথা বলেছেন। আপনার অনুগত ভাই হিসেবে সেটা ভালো লাগেনি মোটেই আবার অস্বীকারও করতে পারছি না। মহাবিপদে আমি দিদি। শুভেন্দু বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোরেদের রানি, এখন উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন। বলছেন রায় মানি না। আপনাকে মানতে হবে না। আর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নেই, তৃণমূল চোর।'

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোরেদের রানি, এখন উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন। বলছেন রায় মানি না। আপনাকে মানতে হবে না। আর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নেই, তৃণমূল চোর।'

এসএসসি নিয়োগের পুরো প্যানেলই বাতিল নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে শাসকদলের গালে 'সপাটে চড়' হিসেবে দেখছেন বিরোধীরা। কিন্তু দিদি, আমার মনে পড়ছে অন্য কথা। সেই যে হরিয়ানায় শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির দায়েই জেলে যেতে হয়েছিল সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালাকে। কিন্তু সেই দুর্নীতির থেকে অনেক বড়ো কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আপনি কিছু বললেও, ভাইপো সমেত অন্য নেতারা কিন্তু চুপচাপ। সব দোষ কি তবে আপনারই বলতে চাইছেন ওঁরা? জানি না দিদি। সাবধানে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতি তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। এখনও পর্যন্ত বক্তৃতার মধ্যে আপনি দু' অক্ষরের গালাগাল দিয়েছেন। এখন যা অবস্থা তাতে চার অক্ষর, ছ' অক্ষর বেরিয়ে গেলে কিন্তু আরও কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। □

ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্পপত্র আগামী ভারত নির্মাণের রূপরেখা

প্রদীপ মারিক

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে এনডিএ-র নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে যে নীতি গ্রহণ করেছে তা হলো— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'। গত ১৪ এপ্রিল, বাংলা নববর্ষের সকালে সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিনে ভারতীয় জনতা পার্টি ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছে, যেখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সমাজের চারটি শ্রেণীর উপর— মহিলা, যুবক, কৃষক (অন্নদাতা) ও গরিব মানুষ। G - গরিব, Y- যুব, A- অন্নদাতা, N- নারী, অর্থাৎ এই চারটি শ্রেণীর আদ্যক্ষরকে জুড়লে হয়— GYAN (জ্ঞান)। এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে সংকল্পপত্র প্রকাশের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'নারী শক্তি, যুব শক্তি, কৃষক শক্তি ও গরিবদের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য বিজেপির। যাঁদের কেউ গুরুত্ব দেয় না, তাঁদের উন্নয়নই এই সংকল্পপত্রের আত্মা'। এটি বিকশিত ভারতের সংকল্পপত্র। কংগ্রেসের তুলনায় বিজেপির এই সংকল্পপত্রের পরিধি আড়াই গুণ বড়ো। সংকল্পপত্র প্রকাশের আগে প্রায় ১৫ লক্ষ পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জয়যুক্ত হয়ে ক্ষমতায় ফিরলে বিকশিত ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে অঙ্কিত রূপরেখা নিম্নরূপ—

(১) বিনামূল্যে রেশন বণ্টনের প্রকল্প আগামী ৫ বছরের জন্য চালু থাকবে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে রান্নার গ্যাস। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো— প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। এই যোজনার লক্ষ্য হলো মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের আর্থিক সহায়তা দান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো কিছু বন্ধক না রেখে মহিলাদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। বিজেপি প্রকাশিত সংকল্পপত্র অনুযায়ী, এই ১০ লক্ষের অঙ্ক এবার বেড়ে হবে ২০ লক্ষ। তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের উদ্যোগপতি করে তোলার লক্ষ্যে স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে ব্যাংকগুলির মাধ্যমে তাঁদের ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মহিলা কয়ার যোজনার অধীনে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের দুইমাস ব্যাপী মাসিক ভাতা-সহ প্রশিক্ষণদানের পর তাঁদের গৃহীত প্রকল্পের জন্য ঋণদান করা হয়। মহিলাদের দ্বারা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলারা বা যাঁদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম, তাঁরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। লাভজনক আর্থিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য ঘোষিত হয়েছে 'মহিলা সম্মানপত্র'। দু'বছরের জন্য দু'লক্ষ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পাবেন মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি'র লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল। এই সংকল্পপত্রে ৩ কোটি বোনকে লাখপতি দিদিতে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। দেশের মহিলারা ড্রোন ব্যবহার করে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সঙ্গে সমাজের সামাজিক উন্নয়নেও শামিল হতে পারেন তার জন্য ঘোষিত হয়েছে 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। ২০২৪-'২৫ ও ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দল বা সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা কৃষিকাজের সুবিধার জন্য এই ড্রোন ভাড়ায় দিতে পারবেন কৃষকদের। সংকল্পপত্রে উল্লেখিত হয়েছে যে আগামী ৫ বছর নারীশক্তিই হবে দেশের ভিত্তি। ক্ষমতায় ফিরলে ১০ কোটি বোনকে আইটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রিটেলের কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

(২) ভারতকে গ্লোবাল নিউট্রিশন হাব বানানোর জন্য শ্রীঅন্নের উপরে জোর দেওয়া হবে। এর ফলে ২ কোটিরও বেশি কৃষক উপকৃত হবেন। ফিশারি (মৎস্যচাষ) ও স্টোরেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হবে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনায় ৩৮ লক্ষ কৃষক উপকৃত এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার

অধীনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের কৃষিকাজের সুবিধার্থে প্রতি বছর তিনটি কিস্তির মাধ্যমে ৬০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দান করে কেন্দ্রীয় সরকার। এখনও পর্যন্ত এই যোজনায় ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকদের প্রদান করা হয়েছে। কৃষিকাজে জলসেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে— প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষিজমিতে জলসেচের মাধ্যমে প্রতি ফোঁটা জলে বেশি ফসল ফলানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কেন্দ্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' নামক শস্য বিমা প্রকল্প। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীটপতঙ্গ, খরা ও বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি হলে এই বিমা প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। জৈব কৃষি, জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ, তার সার্টিফিকেশন, লেবেলিং, প্যাকেজিং ও পরিবহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা' প্রকল্পের অধীনে প্রতি তিন বছরে কৃষকদের হেক্টর প্রতি ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়। এই আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্য ভারতব্যাপী জৈব চাষে উৎসাহদান।

কৃষকদের কৃষি বা কৃষি ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করেছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অধীনে ভারত সরকার কৃষিতে সরকারি ভরতুকি হিসেবে বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে কৃষি ঋণ দিয়ে কৃষকদের সহায়তা করে। এখনও পর্যন্ত ২.৫ কোটি কৃষক এই প্রকল্পের সুবিধালাভ করেছেন। কৃষিক্ষেত্র-সহ সমগ্র ভারতের উন্নয়নে ভারত সরকার প্রণীত— 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান'-এর মন্ত্র আজ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভারতবাসীর কণ্ঠে সমোচ্চারিত।

(৩) গবেষণা ক্ষেত্রের উন্নতিতে ভারত সরকার তৈরি করছে একটি অর্থভাণ্ডার। 'টেক স্যাভি' দেশ গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে যা নবীন প্রজন্মের জন্য সৃষ্টি করতে চলেছে এক স্বর্ণযুগ। এক লক্ষ কোটি টাকার যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরি চলছে, সেই ভাণ্ডার থেকে আগামী ৫০ বছরের জন্য প্রদত্ত ঋণ হবে সুদবিহীন। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া যাবে। কোনো সুদ ছাড়া এই আর্থিক ঋণদান বেসরকারি ক্ষেত্রকে করে তুলবে গবেষণা অভিমুখী। নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্যক জ্ঞান জন্মাবে। উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া যাবে অল্প খরচে, উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখাবে ভারত।

(৪) কৃষক বা অন্নদাতাদের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে গরিব কল্যাণে। গরিব মানুষের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে ভারত সরকার। সরকারের সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। গত ১০ বছরে রেকর্ড সময়ের মধ্যে সরকারের তরফে প্রতিটি পরিবারে জল, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস ও ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র দেশের জন্য একটি বৃহৎ খাদ্যভাণ্ডার ভারতে নির্মিত হয়েছে। আগামীদিনে ৪০ হাজার রেলবগি পরিবর্তিত হবে বন্দে ভারত স্ট্যান্ডার্ডে। যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রেলওয়ের জন্য তিনটি (সিমেন্ট, মিনারেল / খনিজ ও শক্তি) ইকোনমিক রেলওয়ে করিডোর বা এনার্জি ইকোনমিক করিডোর তৈরি হবে। এছাড়াও, পোর্ট কানেক্টিভিটি করিডোর (রেল সাগর), হাই ট্রাফিক ডেন্সিটি করিডোর তৈরি হবে। এর ফলে রেলযাত্রা, রেল পরিবহণ হবে আরও সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ। এতে বৃদ্ধি পাবে দেশের জিডিপি।

দেশের এই উন্নয়নযজ্ঞে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোনো ভারতবাসী যাতে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে সোশাল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায়ের রাজনৈতিক স্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'নিরপেক্ষতা'-র নীতি অবলম্বন করেছে কেন্দ্র। দুর্নীতি দূর করার সঙ্গে বন্ধ হয়েছে স্বজনপোষণ, পরিবারতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দেশে ৪ কোটি পাকাবাড়ি তৈরির তথ্য এই সংকল্পপত্রে উল্লেখিত হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে দু'লক্ষ পঞ্চায়েত। ফাইবার অপটিক্স বা অপটিকাল ফাইবারের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিও। টানা তৃতীয় বার জয়যুক্ত হলে বিজেপির সংকল্পপত্র অনুযায়ী, 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় সত্তরোর্ধ্ব সমস্ত মানুষ পাঁচলক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। ট্রান্সজেন্ডার ও রূপান্তরকামীদেরও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শক্তি বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় প্রকল্প'। অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীজী সূর্যবংশী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বাড়ির ছাদে একটি সোলার প্যানেল বা সোলার রুফটপ সিস্টেম থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার দেশের এক কোটি বাড়িতে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চালু করেছে 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা'। এতে প্রতিটি পরিবারের প্রতি বছর বিদ্যুতের বিল বাবদ প্রায় পনেরো হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। এই যোজনাটি ছাড়াও প্রতি মাসে প্রতিটি পরিবার পিছু ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর ফ্রী ইলেকট্রিসিটি স্কিম' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রতিটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর ব্যাপারে নাগরিকদের উৎসাহদান ছাড়াও পরিবারগুলির কাছে সারা মাসে সাশ্রয় হওয়া বিদ্যুৎ বিক্রির সুযোগও থাকবে।

বন্দে ভারত স্লিপার, বন্দে ভারত চেয়ারকার এবং বন্দে ভারত মেট্রো দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে বিজেপি। আমেদাবাদ-মুম্বই বুলেট ট্রেনের কাজও চলছে পূর্ণ উদ্যমে। সংকল্প পত্রের ঘোষণা অনুযায়ী, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে একটি করে বুলেট ট্রেন চলবে। তার সমীক্ষার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সংকল্পপত্রের ঘোষণা অনুযায়ী দেশে সৃষ্টি হবে গ্রিন জব। দেশে ইলেকট্রিক ভেহিকলের বিক্রি বাড়ানো হবে। মহাকাশ ক্ষেত্রেও ঘটবে উন্নতি। সামাজিক স্তরে ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। দেশে ঘটবে উড়ান ব্যবস্থার উন্নতি, তৈরি করা হবে ড্রিম সেন্টার। পর্যটন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটাবে ভারত। প্রাচীন তামিল ভাষার আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও স্বীকৃতির লক্ষ্যে প্রচার করবে বিজেপি। এই সংকল্পপত্রে এক দেশ, এক ভোট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের মতো বিষয়গুলি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করবে ভারত, ২০২৫ সালকে পালন করা হবে 'জনজাতি গৌরব বর্ষ' হিসেবে। ২০২৫ সালে বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী রাষ্ট্রীয় স্তরে পালিত হবে। জনজাতি কলা অ্যাকাডেমি তৈরি ছাড়াও ৭০০-রও বেশি একলব্য স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ ও আইন আনার প্রতিশ্রুতিও এই সংকল্পপত্রের মাধ্যমে দিয়েছে বিজেপি। □

পাকিস্তানকে সতর্ক করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

সিয়াচেনে ‘ভারতমাতা কী জয়’ ধ্বনি জওয়ানদের

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত কারাকোরাম পর্বতমালার সিয়াচেন হিমবাহ বিশ্বের সর্বোচ্চ সামরিক অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত। ভারত-পাক প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার খুব নিকটবর্তী এই অঞ্চলে ভীষণ প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত

লড়াই করতে হয় ভারতীয় জওয়ানদের। তার মধ্যেও দেশকে শত্রুদের হাত রক্ষা করে চলেছেন জওয়ানরা। প্রসঙ্গত, ‘অপারেশন মেঘদূত’-এর অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়লাভ করে সিয়াচেন হিমবাহের উপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। গত ১৪ এপ্রিল এই উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনা সিয়াচেনে তাদের বিজয়ের চল্লিশতম বছর উদ্‌যাপনও করে।

গত ২২ এপ্রিল দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সামগ্রিক সামরিক প্রস্তুতির মূল্যায়ন করতে বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন বেস ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। সেখানে সিয়াচেনকে ‘বীরত্ব ও সাহসের রাজধানী’ বলে অভিহিত করেন তিনি। এর পাশাপাশি সিয়াচেনকে ভারতের ‘সার্বভৌমত্ব এবং দৃঢ়তার প্রতীক’ বলেও উল্লেখ করেছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

এদিন সফরসঙ্গী সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উল্লেখিত এলাকার সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন। এছাড়াও সেখানে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ‘ভারতমাতা কী জয়’ ধ্বনিও তোলেন জওয়ানরা। রাজনাথ যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সাহসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে রাজনাথ সিংহ বলেন, ‘বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন হিমবাহে আপনারা যেভাবে দেশকে রক্ষা করেছেন তার জন্য আমি আমাদের অভিনন্দন জানাই। সিয়াচেনের ভূমি কোনও সাধারণ ভূমি নয়। এটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও দৃঢ়তার প্রতীক। এটা আমাদের জাতীয় সংকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে।’

এরপরেই রাজনাথ সিংহ দেশের রাজধানীর প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ‘আমাদের জাতীয় রাজধানী যেমন দিল্লি, মুম্বই যেমন আমাদের অর্থনৈতিক রাজধানী, প্রযুক্তিগত রাজধানী হিসেবে যেমন বেঙ্গালুরু পরিচিত, তেমনি বীরত্ব ও সাহসের রাজধানী হলো সিয়াচেন।’

পরে এদিন সিয়াচেন সফরের একাধিক ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন শ্রীরাজনাথ। তাতে তিনি লেখেন, ‘সিয়াচেনে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের সাহসিকতা এবং লোহার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সবসময় দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে।’ সেনা জওয়ানদের মিষ্টিমুখও করান তিনি।

প্রতিকূল আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে বহুবার ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে পাকিস্তান। জেহাদের বিষ ছড়িয়ে ক্রমাগত কাশ্মীর উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে চলেছে প্রতিবেশী দেশ। কিন্তু জেহাদিদের সমস্ত ছক বানচাল করে দেশকে রক্ষা করছেন ভারতীয় জওয়ানরা। এর আগে বহুবার রাজনাথ সিংহ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সীমান্তে কোনও দেশের চোখ রাঙানি মেনে নেওয়া হবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এদিন সিয়াচেনের ইতিহাস তুলে ধরে রাজনাথ বুঝিয়ে দিলেন ভারত আজ এমন এক শক্তি হয়ে উঠেছে যাকে পরাস্ত করা সহজ হবে না। তাই নাম না করেও ইঙ্গিতে পাকিস্তানকে সতর্ক হয়ে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সমর-বিশেষজ্ঞরাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যত দিন যাচ্ছে সীমান্তে সামরিক পরিকাঠামো আরও উন্নততর ও শক্তিশালী করছে ভারত। সেনা-আধিকারিকদের মতে, সম্প্রতি এই অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন সিয়াচেন সেনাবাহিনীর সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন রাজনাথ সিংহ ও সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডে। □

ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে গঙ্গা

চঞ্চল কুমার ঘোষ

ভারতসংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। এর মধ্যেই তার সৃষ্টি স্থিতি, তার প্রকাশ। এই সংস্কৃতির প্রাণসত্তা হিমালয় আর গঙ্গা। হিমালয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এর একেক অঞ্চলে এক এক রকম রূপ। কাশ্মীর থেকে অরুণাচল, যেমন তার সৌন্দর্য তেমনই বৈচিত্র্যের বাহার। তবুও যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষের চিরকাঙ্ক্ষিত পথ গাড়োয়ালের গঙ্গার তীর। এই গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়েই যেন পূর্ণ হয় জীবনের সব কামনা-বাসনা- আকাঙ্ক্ষা। ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার আচরণের কত পার্থক্য— তবু ভারতের সব প্রান্তের মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে গঙ্গা। সকলেই গঙ্গার পদতলে এসে প্রণত হচ্ছে। একই সঙ্গে গঙ্গার জলে স্নান করছেন কেরালার অধ্যাপক, তার পাশেই বিহারের চাষি। পঞ্জাবের ড্রাইভারের গায়ে গা ঠেকিয়ে গঙ্গার জলে পবিত্র হচ্ছেন তামিল ব্রাহ্মণ। গঙ্গার বুকে কোনও ভেদাভেদ নেই। গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর সবজায়গায় সেই একই দৃশ্য। মন্দিরে গেলে, দেবতার মূর্তি দর্শন করে তীর্থ পরিক্রমা শেষ। কিন্তু গঙ্গার পথ ধরে এগিয়ে চললে, গোটা পথটাই তীর্থ। এই তীর্থপথের শুরু কয়েক হাজার বছর আগে যখন সিন্ধুতীরের মানুষরা এসে বসতি গড়ে তুলল সরস্বতীর তীরে। যে সরস্বতীর বন্দনায় ঋষিরা মুখর।

আজকের গঙ্গার মতোই তখন সরস্বতীও ছিল বিশালাকায় এক নদী। সিন্ধু ও সরস্বতীর তীরেই গড়ে উঠেছিল বৈদিক সভ্যতা। দুই নদীর জল তাদের লালনপালন করেছে। তাদের সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সৃষ্টির পথকে উন্মোচন করেছে। তারা নতমস্তকে দেবীজ্ঞানে সরস্বতীর প্রতি শ্রদ্ধা আরোপ করেছে। প্রকৃতির পরিবর্তনে একদিন শুকিয়ে গেল সরস্বতী। হারিয়ে গেল তার জলস্রোত। জীবনধারণের প্রয়োজনেই নদী তীরবর্তী মানুষেরা পূর্ব ও উত্তরে যাত্রা করল। চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছল গঙ্গার তীরে। যে নদী সরস্বতীর মতোই বেগবান। স্বচ্ছ সুপেয় জল। দুই তীরে উর্বর জমি। সিন্ধু, সরস্বতী তীরের মানুষরা বসতি স্থাপন করল গঙ্গার তীরে। গড়ে উঠল গাঙ্গেয় সভ্যতা। যে গঙ্গাকে পুরাণকাররা বলেছেন জলশক্তিরূপী দেবী, যিনি জীবনদায়িনী।

গঙ্গার স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠলেন কবিরা। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বলছেন, 'ওগো মা, তুমি পার্বতীর সপত্নী, পৃথিবীর বিলাসহার স্বরূপা ও স্বর্গারোহণের বিজয়পতাকা। তোমার কাছে এই প্রার্থনা, তোমার তীরে বাস, তোমার জলপান, তোমার তরঙ্গ নিরীক্ষণ ও তোমার নাম স্মরণ করতে করতে, তোমাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন আমার দেহাবসান হয়। মহাভারতকার বলছেন, 'গঙ্গার মতো তীর্থ নেই। যেখানে গঙ্গা আছেন, সেই স্থানই যথার্থ বাসভূমি।'

শুধু রামায়ণে বা মহাভারতে নয়। আমাদের পুরাণে, কাব্যে, কবিতায়, চারণ কবিদের কণ্ঠে, মানুষের অন্তরে গঙ্গা আর নদী নন, তিনি জননী। যিনি সব পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করেন। তিনি মর্ত্যলোকের কেউ নন। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন মানুষের উদ্ধারের জন্য। গঙ্গার নদী সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তার দেবীসত্তা। তাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মানুষ তাদের অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করছেন গঙ্গার পদতলে। জন্ম থেকে মৃত্যু, জীবনের সব কিছুর সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে গঙ্গা।

এই প্রসঙ্গে এক বিদেশি পর্যটক লিখেছেন, 'পৃথিবীতে নদীর সংখ্যা কম নয়। দু-হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে। আমেরিকার মিসিসিপি, রাশিয়ার লেনা, ভলগা, চীনের ইয়াং-সি- কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, মিশরের নীল— এরা কোটি কোটি মানুষের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গঙ্গার উদ্দেশে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্তবস্তুতি, পূজা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভক্তি ও অনুরাগ— মানুষের হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নিবেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি না দেখেছেন, তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোনোদিন চিনতে পারবেন না।

গঙ্গার আদি অন্তে— গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর— প্রায় দুই হাজার মাইল চেয়ে থাকলে দেখা যাবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটি মাত্র নদীকে এমন করে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কন্যাকুমারীতে মাদুরাই আর রামেশ্বরমে, আবু পাহাড়ে আর দ্বারকায়, জগন্নাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,— সেখানে শেষ পুণ্যলাভ ঘটবে গঙ্গাজল দানে। এই গাঙ্গেয় সভ্যতা বিশাল ও বিচিত্র ভারতকে সর্বকালজয়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য তো আজ শুরু হয়নি। এর শুরু তো কত শত বছর আগে। যখন হিউ-এন-সাঙ এসেছিলেন প্রয়াগে। দেখেছিলেন গঙ্গা, যমুনা ও অদৃশ্য সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে তৈরি হয়েছে দানক্ষেত্র। রাজধানী নয়, রাজপ্রাসাদ নয়, নগর নয়, ত্যাগের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এই গঙ্গার তীর। রাজা হর্ষবর্ধন একমাস ধরে দীন দুঃখী মানুষের মধ্যে দান করে অবশেষে নিজের দেহের সব অলংকার পরিধেয় মূল্যবান পোশাকটুকু বিলিয়ে দিয়ে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে পোশাক চেয়ে নিয়ে পরতেন। আজও দেখি তারই প্রতিচ্ছায়া, প্রতি বারো বছর অন্তর প্রয়াগ আর হরিদ্বার জুড়ে কুম্ভের স্নান চলে। তখন কুম্ভমেলা লক্ষ কোটি মানুষের মিলনক্ষেত্র। সেদিনের রাজারা আসতেন দান দিতে। সাধারণ মানুষ আসতেন দান গ্রহণ করতে। আজ মানুষ কেউ দান গ্রহণ করতে আসেন না। আসেন এই পুণ্য গঙ্গার জলে স্নান করে সমস্যাসঙ্কুল জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে পেতে।

তাই এই গঙ্গার তীরেই হয় কল্পবাস, ধ্যান, উপবাস। ভারতবর্ষের মানুষের বিশ্বাস, দুই দেবতাকেই একমাত্র প্রত্যক্ষ করা যায়— এক সূর্য আর এক এই গঙ্গা। সূর্যকে দেবতার জ্ঞানে স্তুতি করলে, তিনি যেন অন্য জগৎ থেকে আমাদের দিকে তাঁর করুণাটুকু প্রকাশ করেন। গঙ্গা তো সর্বসত্তা দিয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। তিনি আমাদের মাতা। মা যেমন সন্তানকে স্পর্শ করেন, স্নেহের নিগড়ে আপন অন্তর মধ্যে স্থান দেন। গঙ্গাও তাই। তিনি শুধু দেবব্রত ভীষ্মের মাতা নন, তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির মাতা।

সমস্ত নদীর মধ্যেই এই মাতৃরূপ বর্তমান। মহাভারতে নদীকে বলা হয়েছে 'বিশ্বস্য মাতরঃ'। স্তন্যদায়ী মায়ের মতো এই নদীর বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি, কবি, দ্রষ্টারা নিজেদের সব কবিত্ব, শ্রদ্ধা, ভক্তিটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। নদী এক অর্থে সংস্কৃতির ধারা। যদিও ভারতের প্রান্তে প্রান্তে এই ধারা পৃথক। গঙ্গাই সেই বিবিধের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে।

মাতা যেমন কোনও ভেদ না করে সকল সন্তানকে একইভাবে নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখেন, গঙ্গাও তাই। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে

ফঃ ২

পশ্চিম সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। তাই পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা যথার্থই বলেছেন, গঙ্গা সমস্ত দেশকে এক ঐক্যবদ্ধতার রূপ দিয়েছে। গঙ্গা শুধু পবিত্র নদী নয়। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ভারতের একাত্মতা। গঙ্গা বিনষ্ট হওয়ার অর্থ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

গঙ্গা ভারতবর্ষের আয়তনের মাত্র বারো শতাংশ এলাকার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী এই সমভূমির বাসিন্দা। ভারতের অবশিষ্ট অংশ যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, সেখানে কি গঙ্গার কোনও প্রভাব নেই? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে দক্ষিণের নদীগুলোর দিকে তাকালে। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠতম নদী গোদাবরী। গঙ্গার মতো গোদাবরীর উল্লেখ পাই রামায়ণে। বনবাসের সময় এই গোদাবরীর তীরে কুটীর বেঁধে থাকতেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। এখানেই ছিল পঞ্চবটী বন। এই গোদাবরী দক্ষিণের পবিত্রতম নদী। সেই কারণেই গোদাবরীকে বলা হয় দক্ষিণের গঙ্গা। এখানকার মানুষ গঙ্গাজলপূর্ণ কলসীর অর্ধেক ঢেলে দেন গোদাবরীর জলে। তারপর আবার সেই গোদাবরীর জলে পূর্ণ করেন কলস। এ ভাব আর ভক্তির মিলন। এ মিলন সাংস্কৃতিক মিলন। শুধু গোদাবরী নয়, দক্ষিণের আরও বহু নদীর নাম গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। গোদাবরীর দুটি উপনদীর নাম পেনগঙ্গা আর ওয়েন গঙ্গা। মহারাষ্ট্রের একটি নদীর নাম দামন গঙ্গা।

প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার মহিমা শুধু দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষকে গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধাবান করেছে তাই নয়, সেখানকার বিভিন্ন রাজারাও ছিলেন গঙ্গার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাই দেখা যায় চোল, চালুক্য রাজবংশের সময়ে মন্দিরের গাত্রে গঙ্গার নানান কাহিনির প্রকাশ। রাজারা বড়ো কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করার পর গঙ্গাইকোন্ড উপাধি ধারণ করতেন। চোলরাজা রাজেন্দ্র একটি যুদ্ধ করে বিরাট এক জলাশয় স্থাপন করেছিলেন। পরাজিত রাজারা কর হিসেবে বড়ো বড়ো পাত্রে গঙ্গাজল এনে সেই জলাশয় পূর্ণ করে দিতেন। শ্রীলঙ্কায় রয়েছে কেলানি গঙ্গা ও মহাবলী গঙ্গা। এই গঙ্গাকে আমরা অন্য নদী বা জলাশয়ের প্রতীক হিসেবে দেখি। এই নদীর সঙ্গে অন্য নদীর নাম একাত্ম হয়ে থাকলে তো যে গঙ্গার মাহাত্ম্য বাড়ে তাই নয়, সে নদীরও মাহাত্ম্য বাড়ে। তাই শুনি হিমালয় জুড়ে কত গঙ্গা— কেদার গঙ্গা, জাহ্নবীগঙ্গা, হরিগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, ভৃগুগঙ্গা।

শুধু সংস্কৃতি নয়, মানুষের জীবন ধারণ, সেখানেও যে মায়ের মতো নির্ভর করে রয়েছে গঙ্গার জলধারায়। তাই দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় সভ্যতায় মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছে এই গঙ্গার তীরে। যখন মানুষ, বৃষ্টির জল থেকে বঞ্চিত হয়, তখন নদীর জলই তাকে পুষ্ট করে। প্রবল গ্রীষ্মে যখন সকলে ক্লান্ত বিধ্বস্ত, তখন গঙ্গার জলে অবগাহন করে শরীর-মন জুড়িয়ে আসে। গঙ্গার তীর ধরে চলতে চলতে চোখে পড়ে শস্য শ্যামলা ক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, নগর শহর, সে তো সব নদীর মধ্যেই একাত্ম হয়ে রয়েছে।

গঙ্গোত্রীর বরফগলা জলে দাঁড়িয়ে করজোড়ে গঙ্গাস্তুতি করছেন একালের তরুণী। কিংবা কোনও দীন দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁদের সামান্য সম্বলটুকু ব্যয় করে এসেছেন হরিদ্বারের হর-কি-পৌড়ির গঙ্গার ঘাটে শুধু একটিবার গঙ্গা স্নান করে জীবনের সব গ্লানি পাপ মুছে ফেলে আত্মশুদ্ধির আশায়, কিংবা মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে মানুষ কণ্ঠে ধারণ করে এক ফোঁটা গঙ্গার জল, তখন সেই জল ধারণকারীর কাছে গঙ্গা আর সাধারণ নদী থাকেন না, তিনি হয়ে ওঠেন মাতা, দেবী— তাঁর দর্শন তখন শুধু দৃষ্টির দর্শন নয়, হৃদয়ের দর্শন। তাঁর স্পর্শ শুধু শরীরের স্পর্শ নয়, হৃদয়ের স্পর্শ।

এই গঙ্গাস্তুতির কথা শুনি মুসলমান কবি দরাফ খাঁর রচনায়।

'জল বলতে তো এই গঙ্গাজল, এতেই যেন জীবনাবসান হয়। যদি দেহ ফিরে আসে তবে তা হবে দেবদেহ।'

গঙ্গা তো শুধু ভক্তি আর ভাবের প্রতীক নয়, সে ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা, জীবনচর্যার প্রতীক। তাই ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গঙ্গাকে সম্বোধন করে বলেন, 'কত উত্থান-পতনের, কত সাংস্কৃতির ভাঙাগড়ার, কত যুদ্ধের, কত মিলনের ঘটনা তুমি জান মা। কত প্রাসাদ নগরী গড়ে উঠল, কত তীর্থস্থান, তোমারই তীরে তীরে— গ্রামীণ সভ্যতা, নগর সভ্যতা— এক আশ্চর্য মেলবন্ধনে বাঁধা পড়ল।'

এই কথাগুলি তো শুধু আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়। এ বাস্তব সত্য। গঙ্গার সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে হরিদ্বার, লছমনঝুলা, কনৌজ, বারাণসী, প্রয়াগ, পাটলিপুত্র, এমনকী আজকের কলকাতা— এইসব বহু মানুষের বাসভূমি, প্রতিটি স্থানের গড়ে ওঠার বহু বিচিত্র কাহিনি। গঙ্গারই আরেক রূপ দেখি তার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের রূপ— বারাণসীর গঙ্গার তীরে দেখি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধধর্মের এক আশ্চর্য মিলন— মন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি, মসজিদের আজানের সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ঘাটে শোনা যায় বিসমিল্লা খানের সানাই, অনুপ জালোটার কণ্ঠে কৃষ্ণ ভজন— গায়ে গা ঠেকিয়ে সেই সুরে আপ্লুত হয়ে যান ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষ। আর প্রয়াগ, সে তো সংস্কৃতি সমন্বয়েরই ইতিহাস। কুম্ভমেলা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানব সম্মেলন।

আপামর ভারতবাসীর কাছে জন্ম থেকে মৃত্যু প্রায় সব অনুষ্ঠানেই গঙ্গাজল কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতীক। গঙ্গাজল ছাড়া কোনও কাজই সম্পন্ন হয় না। এই গঙ্গা কল্যাণময়ী। কারণ তিনি জননী। সকল দূষণের মধ্যেও তিনি পবিত্র। মা তাঁর সন্তানকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেন। এই দেহের মধ্যেই থাকে মল, মূত্র। তার মধ্যেই বড়ো হয় সন্তান। জন্মের পর সেই সন্তানকেই মা প্রতিপালন করেন। এত কলুষ ধারণ করেও মা চিরপবিত্র। গঙ্গাও লক্ষ লক্ষ বর্জ্য, দূষিত পদার্থ বক্ষে ধারণ করেও পবিত্র, কারণ তিনি ভারতবাসীর মা।

গঙ্গা পরিক্রমা শেষ করে তাই কারও কণ্ঠে বেজে ওঠে পূর্ণ উপলব্ধির সুর— 'গঙ্গার তীরে তীরে ভারতের আত্মাকে দর্শন করে গেলুম। জেনে গেলুম এই পথে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কাটানো যায়। মানুষের যা কিছু ভাবনা, শ্রেষ্ঠ যোগসাধনা, মানবাত্মার নিগূঢ় রহস্যলোক থেকে যা কিছু উদ্ভব হয় এই পথে তার অভিব্যক্তি।

এ তো দার্শনিকের অনুভব উপলব্ধি। আর বুড়ো গোলু মিশ্র। বিঠুরের গঙ্গায় তিন পুরুষ ধরে নৌকা বায়। গঙ্গা ওর আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। নৌকার ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলে গোলু মিশ্র। গঙ্গাকে আমরা কেন মা বলি জানেন? মা যেমন বুকের স্তন্যসুধা দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করে, গঙ্গাও তেমনি করে আমাদের লালনপালন করে। এই গঙ্গার জলে জেলেরা মাছ ধরে, মাঝি নৌকা বায়। মানুষকে পারাপার করে। চাষিরা তার জলে ফসল ফলায়। মৃত্যুর পরে গঙ্গার জলেই ভেসে যায় চিতাভস্ম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সব কিছুকে ধারণ করে আছে গঙ্গা। তাই তিনি সকলের মা।

নিরক্ষর সহজ সরল মানুষ মাঝি, তাই বোধহয় এমন সহজ করে কথা বলতে পারে। দিন শেষ হয়ে অন্ধকার নামে। আকাশে মাটিতে, গঙ্গার জলে। কাছেই কোনও মন্দিরে ঘণ্টা বাজে। গঙ্গার তীরে মন্দিরে স্তব বন্দনা শুরু হয়। মাঝি গুনগুন করে গলা মেলায়। এই ভক্তি, এই সুর, এই বন্দনা একই সঙ্গে ধ্বনিত হয় গঙ্গোত্রীতে, উত্তরকাশীতে, হৃষীকেশে, হরিদ্বারে, বারাণসীতে, গঙ্গাসাগরে। একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে— সর্বত্রই তিনি মা, তিনি জননী জাহ্নবী। □

গঙ্গামায়ের নির্দোষ সন্তান

কল্যাণ গৌতম

দশহরা। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা-দশমী। খুব ছোটোবেলায় বাবা-মা এইদিন সকালে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, আমিও সঙ্গে যাবার সুযোগ পেয়েছি। খড়দহের বারো-মন্দিরতলা ঘাট। বলতাম, বাবা, তোমরা প্রতিবছর এই দিনে স্নান করতে আসো কেন? বাবা বলতেন, এই দিন গঙ্গাস্নান করলে বিগত দশজন্মের যাবতীয় পাপ দূর হয়। সেজন্যই এর নাম 'দশহরা'। দশদোষ-কে হরণ করেন যিনি, তিনি পতিতপাবনী গঙ্গা। বলেছিলাম, তুমি কোনো পাপ করতেই পারো না। কারণ পাড়ার সবাই বলেন, তুমি 'অজাতশত্রু', ঈশ্বরের পুত্র। যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, বাড়িওয়ালা কাকু বলতেন, রহড়া-খড়দায় নাকি এমন মাস্টারমশাই বিরল। নকশাল পিরিয়ডেও অনেক রাতে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফিরতেন তিনি। তখন শিক্ষকদের মাইনে খুবই কম ছিল, তার উপর ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। বাবা দীর্ঘদেহী, সৌম্যকান্তি চেহারা, ধুতি-পাঞ্জাবি ও চশমা পরিহিত, পিছনে আঁচড়ানো চুল, কাঁধে-ব্যাগ, হাতে টর্চ; দূর থেকে এই মানুষটাকে যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকেরা দেখলেই কোলাহল বন্ধ করে চুপ করে সরে যেতেন। ক্লাসে ফাঁকি দিতে জানতেন না তিনি, পিছিয়ে পড়া ছেলেদের খুব যত্ন করে পড়াতেন, অসীম স্নেহ ছিল তাঁর। আমি মাস্টারমশাইয়ের ছোটো ছেলে বলে কী আদর-যত্নটাই না পেতাম বাবার স্কুলে, এলাকার নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। বাবা আর্থিকভাবে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু মানসিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত ধনী।

বাবা যখন দেহত্যাগ করেন, রহড়া-খড়দহের বহু মানুষ শোকযাত্রায় সঙ্গে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বড়ো নেতার মৃত্যু ছাড়া এমন ঘটনা ঘটতো না তখন। রহড়া-খড়দহবাসী এবং বর্তমানে প্রয়াত বহু প্রবীণ মানুষের মনের কথা ছিল, মিশনপাড়ায় একটি গলির নাম অথবা পানশিলা দেশবন্ধু নগর বিদ্যামন্দির (যে স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন)-সংলগ্ন একটি পথের নাম বাবার নামে হোক, জে.এন লেন (জিতেন্দ্রনাথ লেন) বা জে.এন সরণী। সেটা অবশ্য হবার ছিল না; কারণ একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য, সমর্থক বা নেতা না হলে এমন অঘটন ঘটা সম্ভব ছিল না। তবে বাবার ধর্মীয় মতামত ব্যতিরেকে রহড়া-খড়দহের বামপন্থী নেতা-নেত্রীদেরও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি।

জন্মান্তরে বিশ্বাসী বাবা বলতেন, কোনো জন্মের পাপও যেন না স্পর্শ করে আমাদের, চেতন-অবচেতনে কোনো পাপ যেন আমরা না করে ফেলি, জীবনের কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয় কোথাও। গরিব মানুষের প্রতি ছিল দয়া। গঙ্গাস্নান করে গরিব মানুষকে সাধ্যমত দান করতেন। বাবা দশহরায় স্নানের পর গঙ্গাস্তব করতেন। বাল্মীকি রচিত গঙ্গাষ্টকং স্তোত্র। 'ওঁ মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।' তারপর গঙ্গার প্রণামমন্ত্র— 'সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।/সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

দশহরায় অনেকে অষ্টনাগ ও মনসাদেবীর পূজা করতেন। মায়েরা বলাবলি করতেন, দশহরার দিন বৃষ্টি হতেই হবে; বৃষ্টি না হলে সাপের ডিম ফুটবে বেশি। জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতার সঙ্গে বিষধর সাপের ডিম ফোটার কোনো সংযোগ আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা কী হয়েছে জানি না, তবে লোকবিশ্বাস এরকমই ছিল। আমি আমার মনের সমস্ত গলি, সরণী, রাজপথ বাবার নামেই তো রেখেছি বহুকাল! আমার আদর্শ পুরুষ, আদর্শ শিক্ষক; কোনো পুরস্কার তাঁর দরকার হয়নি। দশহরার দিনে মনে হয়— তিনি গঙ্গার উৎসে, শিবের জটাজালে চন্দ্রমৌলীতে চিরন্তন সৌকর্যে, অসীমের বিরাটত্বের পুরস্কারে গঙ্গাজলে দ্রবীভূত হয়ে আছেন। কোনো দোষ, কোনো পাপ তাঁকে স্পর্শ করেনি। □

গঙ্গাধর মহারাজের গঙ্গাপ্রীতি

অসীমলাল মুখার্জি

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। স্বামীজী তাঁকে সস্নেহে 'গ্যাঞ্জেস' নামে সম্বোধন করতেন। শশী মহারাজ-সহ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুদের কাছে চিঠিতে নিজের পরিচয়বাচক শব্দবন্ধে লিখতেন, 'তোমার দাসানুদাস Ganges'। কারণ তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। মঠে তিনি 'গঙ্গাধর মহারাজ' নামে পরিচিত। তাঁর স্থাপিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম শাখাকেন্দ্র সারগাছি-মুর্শিদাবাদের মানুষ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে ডাকতেন 'দণ্ডীবাবা' নামে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনীতে লিখছেন, গঙ্গাধর তখন ব্রহ্মচর্যের সমস্ত নিয়ম পালন করেন, তিনবার গঙ্গাস্নান করেন, স্বহস্তে রন্ধন করে একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন, মস্তকে তৈলমর্দন করেন না। প্রাণায়াম করতে করতে তাঁর অঙ্গে স্বেদ ও পুলক হয়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে তিনি অনেকক্ষণ কুম্ভক করেন।

হরীতকীর প্রশংসাসূচক শ্লোক শুনে তিনি নিজ অন্তরের মলিনতা দূর করতে শ্রীহরি স্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাজল পান করতেন—

'হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রী জাহ্নবীজলম্।
অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেদ ভক্ষেজপেৎ পিবেৎ।।'

গঙ্গাধর মহারাজের বাল্যকাল কেটেছে আহিরীটোলা পল্লীতে, তা গঙ্গার সন্নিকটে।

গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি'। গঙ্গাধর মহারাজ 'স্মৃতি-কথা'-য় লিখছেন সে কথা। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কয়েকজন ভক্ত এলেন। তিনি তাদের মাদুর পেতে দিয়ে পঞ্চবটীর দিকে বাহ্যে গেলেন। সেখান থেকে নহবতের কাছের ঘাট দিয়ে গঙ্গায় শৌচ করতে গেছেন। তখন ভাটার জল অনেক নেমে গেছে। এমন সময় দেখলেন পেছন থেকে ঠাকুর বলছেন, 'ওরে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি— এখানে কি ছোঁচাতে আছে? যা, হাঁসপুকুরে যা। 'গঙ্গাধর বললেন, 'যদি অন্য জল না পাই?' ঠাকুর বললেন, 'যদি অন্য জল না থাকে, তখন ছোঁচাবি।'

গঙ্গাজলে ভোগ রেঁধে মা কালীকে পরিবেশনের পরে যে আর আমিষ-নিরামিষ ভেদ থাকে না, গঙ্গাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেকথা। গঙ্গাধর তখন মালসা পুড়িয়ে হবিষ্যি করেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভোগারতির পর তিনি শিষ্যকে মা-কালীর প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন, 'যা, গঙ্গাজলে পাক, মা-কালীর প্রসাদ, মহাহবিষ্যি— যা, খেগে যা।' ঠাকুর তাঁকে বিষ্ণুঘরে প্রসাদ নিতে না বলে কালীঘরে পাঠালেন। কালীঘরে মাছ রান্না হয়। মুখ ফিরিয়ে গঙ্গাধর একবার দেখলেন, ঠাকুর দূরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর গতি লক্ষ্য করছেন। গঙ্গাধরকে সেদিন কালীর প্রসাদই গ্রহণ করতে হলো। ঠাকুর সেদিন তাঁকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সংযম নিন্দনীয় নয়, কিন্তু আচারের আধিক্যই অন্যায়। তাঁর বুড়োপনার নিন্দা করলেও ঠাকুর জানতেন, গঙ্গাধরের সত্ত্বগুণ বেশি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এক ভিখারি পয়সা চাইতে এলে, তিনি গঙ্গাধরকে দিয়ে তাকের উপর রাখা চারটে পয়সা পাঠালেন। পয়সা দিয়ে ফিরলে তিনি গঙ্গাধরকে গঙ্গাজলে হাত ধুইয়ে মা-কালীর পটের সামনে নিয়ে গিয়ে হরিবোল বলিয়ে অনেকবার হাত ঝাড়িয়েছিলেন। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাস্নানে গিয়ে দেখেন ঘাটে এক ব্রাহ্মণ খাজাঞ্চির সঙ্গে বৈষয়িক বিষয়ে কথা বলছেন। ব্রাহ্মণ বিদায় নিলে তিনি গঙ্গাধরকে দিয়ে বিষয়ীর স্পর্শযুক্ত স্থান গঙ্গাজলে ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

গঙ্গাধর মহারাজ হিমালয়-প্রেমী ছিলেন। হিমালয় ভ্রমণের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই ভ্রমণ-সাহিত্যের মধ্যে হিমালয় উদ্ভূত গঙ্গার কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ 'তিব্বতের পথে হিমালয়'। সেখানে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন মহারাজ। 'অপরাবিদ্যারূপিণী শ্রীযমুনা যেন পরাবিদ্যারূপিণী ভাগীরথীর সলিলে মিলিতা হইয়াছে; প্রবৃত্তিরূপা যমুনা আপন লীলা শেষ করিয়া যেন নিবৃত্তিরূপা ভাগীরথীর শান্তিবারিতে নিমগ্না হইয়াছেন।' এ এক দারুণ তত্ত্বকথা!

মৎস্যপুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে আছে—

'যত্রাস্তি গঙ্গা-যমুনা-প্রমাণং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।।'

প্রয়াগ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুগপৎ লীলাক্ষেত্র। দুই পরস্পরবিরোধী ভাবের চরমোৎকর্ষ এখানে দৃষ্ট হয়। প্রয়াগ জীবের

ভুক্তি ও মুক্তিদাতা। প্রয়াগ যেমন প্রবৃত্তিপরায়ণ জীবের পক্ষে কল্পতরু, তেমনই নিবৃত্তিপরায়ণ মুমুক্ষু জীবের পক্ষে মুক্তিদাতা।

প্রয়াগভূমি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান তীর্থ। প্রয়াগরাজ বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের লীলাভূমি। আবার অনন্ত ঐশ্বর্য ও ভোগের লীলাভূমি। এক ঐশী বৈপরীত্য— যমুনা প্রয়াগের বিচিত্র কূলে নিজের অনন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার ঢেলে রেখেছেন। আর গঙ্গা মাহাত্ম্য প্রচারে নিবৃত্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। আপন আপন কাজ সাধন করে জাহ্নবীসঙ্গিনী হয়ে এই নিবৃত্তি লাভ হয়। গতিদায়িনী ভাগীরথী তাই জীবের মোক্ষদায়িনী।

প্রয়াগের প্রাচীন কীর্তির তুলনা নেই। এই পরম মহাক্ষেত্রে রোপিত বীজ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে মহাবেদান্ত-মহীরুহ যা ভারতকে আচ্ছন্ন করেছে। সুবিশাল অনন্তবিস্তীর্ণ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের আশ্রয় হয়েছে। বেদান্তের মহাবিজয়ের নির্ঘোষ প্রথম প্রয়াগেই বেজে উঠেছে। এখনও প্রয়াগে তীর্থ মাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম লহরীর মহাশক্তির প্রভাবে আবহমানকাল ধরে বিচিত্র ক্ষেত্রে অসংখ্য লোকহিতকর মহৎকাজ অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য বিচিত্র ও অলৌকিক কীর্তিসমূহের আধারভূমি পুণ্যধাম এই প্রয়াগ। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হওয়াতেই প্রয়াগভূমির এই বিচিত্রতা, এত শক্তি, এত মহত্ত্ব। গঙ্গা ও যমুনার একত্র সম্মিলনই তার কারণ, এমনটাই উল্লেখ করেছেন গঙ্গাধর মহারাজ। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন— 'শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গিনী যমুনা-দর্শনে যেমন আসন্নমুক্ত পুরুষের হৃদয়েও সেই অনুপমা মধুময়ী ভগবল্লীলারসমাধুরী পান করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তেমনি অন্তসলিলা ভাগীরথী দর্শনেও জীবের সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়।'

একবার হিমালয়ের পথে নিভৃত গঙ্গোত্রীর দিব্যভূমিতে সপ্তাহকাল কাটিয়ে উত্তরকাশীর পথ ধরলেন মহারাজ। সে সময় তিনি ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হলেন। কাউকে বিব্রত না করে মহারাজ গ্রাম থেকে কিছু দূরে ভাগীরথী-তীরে এক প্রশস্ত শিলাকে আশ্রয় করে নীরবে নির্জনে রোগভোগ করতে লাগলেন। তিন দিন পর কিছুটা সুস্থবোধ করলে এক সুন্দর পাহাড়ি যুবক তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে আপন কুটিরে নিয়ে গেলেন এবং উপযুক্ত পথ্য পরিবেশন করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন। এরপরই দেখা যায় তিনি গঙ্গোত্রী থেকে আনা একশিশি গঙ্গাজল টিহরী থেকে ডাকযোগে বরানগর মঠে পাঠাচ্ছেন। তখন গুরুভাই ও সতীর্থেরা জানতে পারলেন তিনি হিমালয়ে আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বরানগর মঠ থেকে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

তথ্যসূত্র :

স্বামী অখণ্ডানন্দের রচনা সংকলন। সার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ (১৮৬৪-২০১৪), রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ।

(তথ্য সহায়তা ড. কল্যাণ চক্রবর্তী)

দূষণ রুখতে ভারতীয় নদীগুলোর সংস্কার অত্যন্ত জরুরি

তারক সাহা

সারা বিশ্ব চিন্তিত বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে। বিশ্ব মৌসম বিজ্ঞান সংগঠন রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সম্মেলনে যে তথ্য পেশ করেছে তাতে দেখা গেছে যে অধিক বর্ষা, অধিক গরম বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছে বিগত দশকে। গ্লেসিয়র অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য অ্যান্টার্কটিকায় বরফ গলার পরিমাণ পঁচাত্তর শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-২০১০ এই দশকের তুলনায় ২০১০-২০২০ এই দশকে সমুদ্রের জলস্তর অত্যধিক বেড়েছে। বেড়েছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও।

গঙ্গাসমগ্র কর্মশালায় দত্তাত্রেয় হোসবালে এবং স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী (ফ: চি:)

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হলেও আট বছর পরে তার নিট ফল শূন্য। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে বিস্তর মতান্তর। বিকশিত দেশগুলো পরিবেশ দূষণের দায় বিকাশশীল দেশগুলোর ওপর চাপাতে চাইছে। পরিণামে সমস্যা আরও গম্ভীর হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনের উৎপাদন কমাতে সরকার ও জনগণের মধ্যে যে সমন্বয় দরকার তা আদৌ হচ্ছে না। তবুও ভারতের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। কপ-২৮ সম্মেলনে ভারত কার্বন ক্রেডিটের বর্তমান স্থিতি বদলাতে সুপারিশ করেছে। কার্বন ক্রেডিটের এই চক্র ব্যবসায়িক মহল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ প্রায় নেই। এই জন্যই বিষয়টিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে হবে। এই বিষয়ে চারদিকে যখন গ্রিন হাউস গ্যাসের বাড়বাড়ন্ত ঠিক তখনই ভারতের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ২০২১ সালে মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন সবচেয়ে কম হয়েছে। ভারত একমাত্র দেশ প্রকৃতি ও মানবকল্যাণকে পৃথক ভাবে দেখে না।

পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে বিগত একদশক ধরে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে 'গঙ্গা সমগ্র' নামক সংগঠনটি। ভারত নদী মাতৃক দেশ। দেশের বিভিন্ন নদীর অবদান অপরিসীম। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, বিপাশা, কাবেরী প্রভৃতি নদী। এদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে গঙ্গা আরতি, ঘাট সংস্কার, নদীবক্ষে বর্জ্য পদার্থ না ফেলা, নদীর তটে বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে সারা দেশে সারা বছর ধরে গঙ্গা সমগ্র।

হরিদ্বারে এক সভায় আধুনিক জীবন ধারায় গঙ্গা-সহ বিভিন্ন নদ নদীর উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলে বলেন, গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে আমাদের জীবনশৈলীতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। গঙ্গাকে অবিরল ও নির্মল রাখতে জীবনধারা পরিবর্তন ছাড়া অন্য কিছু উপায় নেই। গঙ্গাই দেশের জীববৈচিত্র্যের উৎস। নদী সংরক্ষণ আমাদের ধর্ম। দুনিয়ায় অনেকেরই অভ্যেস হয়েছে প্রথমে নষ্ট করো পরে তার পরিবর্তন করো। এর পরিণামে বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন। এর প্রতিরোধে মানুষের জীবনশৈলীর পরিবর্তন আবশ্যক। জি-২০-র মাধ্যমে ভারত সারা দুনিয়ায় এই বার্তা দিয়েছে। ভারত সেখানে গঙ্গার গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছে গঙ্গা ভারতের সংস্কৃতি এবং এর দুই পাড়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতা। গঙ্গা জাতির আত্মা এবং গঙ্গা এবং নদীসমূহ ছাড়া ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন।

নদীমাতৃক ভারতীয় নদীগুলোর ইতিহাস অতি মনোহর। প্রত্যেক নদীর একটি ইতিহাস আছে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, বিপাশা, কাবেরী প্রভৃতি নদী ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরার ধারক বাহক।

গোমতী নদী গঙ্গার চেয়েও প্রাচীন। এই জন্য একে আদি গঙ্গাও বলা হয়। মনু ও তাঁর পত্নী শতরূপা, তাঁদের পৌত্র হলেন বিখ্যাত ভক্ত ধ্রুব। ধ্রুবের কন্যা দেবহুতির পুত্র সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিলমুনি। তিনি জীবনের পরবর্তী সময়ে গোমতীতটে তপস্যা করে ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করে বরদান প্রাপ্ত হন।

গোমতী নদী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রী। একথাও বলা হয় যে, রামায়ণে রাবণ হত্যার পর ব্রহ্মহত্যার পাপস্খালনের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠের নির্দেশ মতো গোমতী নদীতে অবগাহন করেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ধনুষ সেই জলে শোধন করেন। এই স্থানটি বর্তমানে উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলার অন্তর্গত লম্ভুয়া অঞ্চলে 'ধোপাপ' নামে বিখ্যাত। প্রবাদ যে, দশহরা তিথিতে এই জলে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। কথায় বলে—

গ্রহণে কাশী, মকরে প্রয়াগ
চৈত্র নবমীতে অযোধ্যা, দশহরায় ধোপাপ।

গোমতী গঙ্গার মতো এক প্রধান নদী। গোমতীর সাতাশটি শাখা নদী রয়েছে। এর মধ্যে কিছু নদী বিলুপ্ত। নদী তীরের শহরগুলোর বর্জ্য পদার্থ প্রদূষণ করছে সব শাখা নদীকে।

গোমতীতে জলের চেয়ে বেশি প্রবাহিত হয় শিল্পের বর্জ্য। উত্তরপ্রদেশ সরকার মানছে যে নদী দূষণ ভয়ানক ভাবে বেড়েছে। শুধু এটুকু নয়, ইউপি সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এনিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছে।

সাধারণ শিল্প ও চিনি শিল্পেরই বর্জ্য ২০১৮ সালে নিষ্কাশিত হয়েছে এক লক্ষ দু' হাজার ছাব্বিশ লিটার। কেবল লক্ষ্ণৌ শহরে বর্জ্য ৩৫ লক্ষ লিটারের ওপর। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে গোমতীর দূষণ পরিস্থিতি অতীব শোচনীয়। নদী কেবল ঘাট বা তার সৌন্দর্যায়নের জন্য নয়। নদীর অবিরল প্রবহমানতা বজায় রাখতে নিরলসভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ গঙ্গা সমগ্র সংগঠন। □

গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি এবং রাজনীতি

দেবজিৎ সরকার

'মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালি বাস করি সেই তীর্থে-বরদ বঙ্গে'।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় বাঙ্গালির অস্মিতার বিরচনা এভাবেই শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে বেশ কয়েক দশক ধরে ভাটিয়ালি সুরে ভূবিখ্যাত গায়ক সুরকার ভূপেন হাজারিকা 'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা'— শুনিয়ে গেলেও এই পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির কাছে পদ্মাকে মা বলে ডাকার ইচ্ছের ওপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পাথর চাপার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি মুসলিম লিগের গুন্ডামির কাছে আত্মসমর্পণকারী নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস যখন Radcliffe line যা Cyril Radcliffe ১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করে--- তা ছিল প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ের মধ্য দিয়ে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী গঙ্গা গঙ্গোত্রী থেকে জন্মলাভ করে ভারতভূমির বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকুড়ের কাছে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বাকি অংশ বাংলাদেশ সীমানার দশ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) দূরত্বে ফারাক্কা বাঁধ পেরিয়ে আহিরণের কাছে প্রবেশ করে পদ্মানদী নাম নিয়ে বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই পদ্মানদী পরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র নদের বৃহত্তম শাখানদী যমুনা ও পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখানদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপুল জলরাশি নিয়ে বাংলাদেশস্থিত বঙ্গোপাসাগরে মিশেছে।

ভারত ভেঙে পাকিস্তান হওয়ার পরে ১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানস্থিত নদীগুলির বিষয়ে ভারত-পাকিস্তান জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানস্থিত যে ৫৪টি নদী ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে, সেই সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়নি। ফলত সুদীর্ঘ ৩৫০ কিলোমিটার গঙ্গা অববাহিকার অন্তর্গত বিস্তৃর্ণ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল যা ভারত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের অন্তভুক্ত সেই এলাকায় গঙ্গা নদীর জল বণ্টন বিষয়টি অন্ধকারেই থেকে যায়।

১৯৭১ সালে 'মুসলমান জাতিতত্ত্বকে' আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ভাষাগত কারণকে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে 'ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয় যা ভারতের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে দুই দেশের মধ্যে একটি সংযুক্ত নদী কমিশন গঠনের কথা বলা হয়।

দুই দেশের মধ্যে ওই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের মে মাসে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের গঙ্গার জল বণ্টন বিষয়ে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম হিসেবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি হয়।

ফাইল চিত্র

১৯৭৫-এ মুজিব হত্যার পরে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদের দ্বারা গঠিত প্রবল ভারত ও হিন্দুবিদ্বেষী রাজাকার বাহিনীর সমর্থনে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির বা বিএনপি-র আড়ালে বাংলাদেশ সেনা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। প্রবল ভারতবিদ্বেষী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার আবহে নিরন্তর বয়ে চলা তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গঙ্গার জলবণ্টন বিষয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তৎকালীন বাংলাদেশি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একটি পাঁচ বছরের চুক্তি করেন যার মেয়াদ ১৯৮২ সালে বিনা পুনর্নবীকরণে শেষ হয়। এরপর ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশে রাজনীতি বিভিন্ন দিকে মোড় নিতে থাকে, ফলে গঙ্গানদীর জলবণ্টন বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।

অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর নতুন দিল্লিতে ভারতের

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনা ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গাজলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। তিন পাতার এই চুক্তিটি একটি তিরিশ বছর সময়কালব্যাপী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। বিভিন্ন ঋতুকালীন পরিস্থিতিতে ফারাক্কা বাঁধ থেকে কত কিউসেক জল বাংলাদেশ পাবে, তার সূত্র নিবন্ধিত হয়।

এরপরে ২০০১ সালে বাংলাদেশে আবার রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে প্রচণ্ড ভারত বিরোধিতাকে পাথেয় করে বিএনপি ক্ষমতায় আসে এবং গঙ্গাজল বণ্টনকে ভারত বিদ্বেষের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। এই সময়কালের বিএনপি পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার অনায্য ও চুক্তিবহির্ভূত ভাবে গঙ্গার জল চাইতে থাকে যার লক্ষ্য ছিল খুব পরিষ্কার— প্রথমত, কলকাতা বন্দরের নাব্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ফারাক্কাস্থিত ন্যাশনাল থার্মাল কর্পোরেশনে জল সরবরাহকে কমিয়ে দিয়ে ওখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া। বলাবাহুল্য, কেন্দ্রে তখন অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন প্রবল রাষ্ট্রবাদী সরকারের উপস্থিতির কারণে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের এই ভারতবিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং বাজেপেয়ী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে হুগলী নদীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ গঙ্গানদীর জল প্রবাহিত হতে থাকে। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কাস্থিত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়নি এবং অন্যদিকে হুগলী নদীর জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকায় রক্ষা পেয়েছে কলকাতা বন্দর ও সেখানে কর্মরত অগুন্তি প্রান্তিক পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ইদানীংকালে আবার ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আসন্ন ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে গঙ্গানদীর জলবণ্টন বিষয়টি একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হতে চলেছে। তার কারণ ২০২৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালের প্রতিষ্ঠিত ভারত বাংলাদেশ গঙ্গাজল বণ্টন চুক্তির শেষদিন, ওই বছরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। অন্যদিকে তার আড়াই বছর পরেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন ১৯৯৬ সালের চুক্তির আর্টিকল্ ১২-তে 'It may be renewed by mutual consent' লেখা থাকলেও— পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চুক্তিটির পুনর্নবীকরণ থমকে যেতেই পারে।

গঙ্গার জল আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবন এবং জীবিকার এক অন্যতম উপাদান। এছাড়াও পুণ্যতোয়া গঙ্গা বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ন্ত্রিত তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার বিপ্রতীপে অবস্থানরত ভারতীয় জনতা পার্টি— দুই দলই এই বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে ২০১৬ সালের ২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর তিনদিন ব্যাপী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ভারতীয় পক্ষে মিনিস্ট্রি অব ওয়াটার রির্সোসেস, ভারত সরকারের পক্ষে মন্ত্রকের সেক্রেটারি অমরজিৎ সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসম্পদ দপ্তরের চিফ সেক্রেটারি নবীন পারীকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে পাংশা বাঁধের নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাব দেয়। এর পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎকালীন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। রাজ্যের তরফ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশে পদ্মানদীর উপরে প্রস্তাবিত পাংশা বাঁধ পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভয়াবহ বন্যা ও ভাঙন ডেকে আনবে এবং অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলাগুলি জুড়ে ব্যাপক খরার সূচনা হবে। এরই মধ্যে ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট দুই দেশের সমন্বয়কারী সংস্থা জয়েন্ট রিভার্স্ কমিশনের ৩৮তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিস্তা ও ফেনী নদী ছাড়া মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, জলঢাকা ও তোর্সা নদীর জলবণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশকে তিস্তার জল না দেওয়ার দাবিতে অটল থাকেন। জয়েন্ট রিভার্স্ কমিশনের বৈঠকের আগে ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর ভারতীয় জলশক্তি মন্ত্রক এবং বাংলাদেশের জলসম্পদ মন্ত্রকের মধ্যে একটি মউ সাক্ষরিত হয় এবং ৩ জানুয়ারি ২০২৩ সালে ভারতের পক্ষে জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুদ্ধার দপ্তরের তরফ থেকে দুই দেশের বিভিন্ন নদীর জলবণ্টন নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

এই সময় ভারতের জনসাধারণ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। নর্মদা নদীর জলের দ্বারা মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট-সহ কয়েকটি রাজ্যের বিস্তৃর্ণ খরাপীড়িত অঞ্চলের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বিরোধিতায় এবং নর্মদা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করলে সেখানকার সাধারণ মানুষ ও বন্য প্রাণী বিপর্যস্ত হবে— এই জিগির তুলে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূচনা করেন স্বঘোষিত সমাজকর্মী মেধা পাটেকর। ইনিই তিনি যিনি বাম জামানায় সিঙ্গুর আন্দোলন কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছিলেন।

গঙ্গানদীর জল গাঙ্গেয় অববাহিকার জীবনরেখা। নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ তার ব্যতিক্রম নয়। আসন্ন ২০২৬-এর নির্বাচনে দু' দেশের মধ্যে গঙ্গার জল বণ্টন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে গঙ্গাজল ইস্যু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। ১৯৪৭-এর আরবি সাম্রাজ্যবাদের গুন্ডামি ও জাতিদাঙ্গা এবং পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট র‍্যাডক্লিফ্ লাইন বাঙ্গালিকে নিজভূমে পরবাসী করে গঙ্গা আমার মা বলার পাশাপাশি পদ্মা আমার মা বলা থেকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উদ্বাস্তু জাতিতে পরিণত করেছে। ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন 'গঙ্গা আমার মা' বলা থেকে বাঙ্গালিকে বঞ্চিত করবে কিনা, গঙ্গার প্রবহমান জলধারা বাংলাদেশকে দেওয়ার খয়রাতি করতে গিয়ে শুকিয়ে যাবে কিনা তাঁর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে— রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জনমত গঠন করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের হাত শক্ত হয় এবং ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গাজল বণ্টন চুক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এই আশাতেই বুক বাঁধবে। তবেই ভবিষ্যতের বাঙ্গালি বলতে পারবে 'মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে'।

সামান্য মেয়ে

সামান্য মেয়ে বা সাধারণ নারী কি সত্যিই বিধাতার শক্তির অপব্যয়? না, সবক্ষেত্রে তা বোধহয় নয়। এমনই এক সামান্য ও সাধারণ মেয়ের বিষয়ে আমার এই পত্রের অবতারণা। মার্চ মাসের শেষ দিকে একটা খবর গণমাধ্যমের দৌলতে পাওয়া গেল যে, এক অসাধারণ কিন্তু সাধারণ সামাজিক স্তরের ও নিম্ন আয়ের প্রতিবাদী মেয়ে তথা নারীকে জনতার প্রতিনিধি করে যে কাজটি একটি রাজনৈতিক দল করল তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী কর্ম-প্রয়াস হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, তা সে জেতে বা হারে যাইহোক। আসলে আমরা জানি, পরিচিত জনপ্রিয় নারী-মুখকে অনেক সময় জনতা নির্বাচিত করে অথবা এক এক শাখার কর্মে দক্ষ মহিলাকে রাজনীতিতে নামিয়ে, জনতার সমর্থন আদায়ের প্রথা বিগত এক দশক ধরে ভালোই সচল, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। অথচ ভাবা প্রায় হয় না, যে মহিলা প্রার্থী যে শাখায় কর্মের জন্য জনপ্রিয় হয়েছেন তিনি রাজনীতিতে এসেও সমান দক্ষ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারবেন তো? অথবা পারবেন তো হতে রাজনীতির মূল কথার সমগোত্রজ কিছু— আমি তোমাদেরই লোক হতে? নাকি জনতার সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধির ধ্যানধারণা, কর্মপ্রয়াস, কথাবার্তা, এমনকী আচার- আচরণেও তফাত থেকেই যাবে? অপরদিকে সাধারণ সমাজের প্রতিবাদী, সমাজ-সচেতন, সঙ্কটে স্বজোট গঠনকারী ইত্যাদি একাধিক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ও সত্তার নারী- পুরুষকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভাবাই যায়, তা সে লোকসভা, বিধানসভা যাইহোক। কেননা এরা আমাদেরই লোক, আমাদেরই সত্তার নির্বিকল্প অংশ, যেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সত্তাগুলির সঙ্গে চয়নিত সত্তার তফাত অনেকটাই কম। আমরা চাই কেবল সন্দেশখালির নয়, দেশের আনাচকানাচ থেকে এমন বাধ্যতামূলক নির্বাচন ছাড়াই জনসেবার প্রতিনিধি চয়ন সর্বত্র হোক, হতে থাকুক, অন্তত এরপর থেকে। তাহলে সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের একটা সম্প্রসারিত অবয়ব ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। আর জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, অভাব-অভিযোগ পেশ, সাক্ষাৎ ইত্যাদি একাধিক কর্ম কিছুটা হলেও সহজ হয়ে যাবে। নেতৃত্বের আড়ম্বরপূর্ণ দাম্ভিক ভাবসাবও তেমনটা থাকবে বলে মনে হয় না।

অনেকে বলবেন নেতৃত্বের দক্ষতা সাধারণ নারী-পুরুষের মধ্যে প্রায় থাকে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত অভাব বা পরিষেবা ঘাটতির হালহকিকত এই অতি সাধারণ জনতার দরবারে প্রায় অপরিচিত রেখা পাত্ররা হাড়ে হাড়ে ওয়াকিবহাল। আর নেতৃত্ব তো ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতায় জমাট বাঁধা সৃষ্ট সত্তা। রেখারাও সেভাবে সম্ভবত তৈরি হতে পারে। না হলে সম্ভাবনার গলা টিপে ধরবো, আবার সুযোগও দেব না, আর তাহলেই সুষ্ঠু রাজনীতির প্রয়োজনে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি অবহেলিত সমাজ থেকে কোনোদিনও উঠবে না, আর সাধারণ 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার' বলবার মতো মুখর সত্তাও তৈরি হবে না!

বীরভূমেও এই ধরনের নারী বা পুরুষ যে 'কম পড়িয়াছে' তা নয়। গত কয়েক মাস আগেও সংবাদপত্রে পড়েছি, জনৈকা মহিলা বিগত কোভিডে মৃত স্বামীর শুক্রাণু সংরক্ষণ করে সম্প্রতি মা হয়েছেন সমাজের নানা কুৎসা উপেক্ষা করে। এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে রয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সাধারণ নারী-পুরুষের অভাব এ বঙ্গে তথা ভারতে হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি কেবল সদিচ্ছার অভাব? যারা গড্ডলপন্থী, ভোটসর্বস্ব রাজনীতিমুখী তাদের বলা বিধেয় যে, সবে তো শুরু হলো, এবার যারা রেখা পাত্রকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন তো? অনাগত ভাবীকালই এর সদুত্তর দিতে পারবে!

—কবিতা দাস,
রামপুরহাট, বীরভূম।

বামপন্থীদের এত মিঞাপ্রীতি কেন?

ভারতের স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগ নেতা জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পৃথক গঠনের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়েছিল পাকিস্তান তখন স্থির হয়েছিল, অখণ্ডবঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছিলেন পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। তিনি দাবি করলেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ কেন পাকিস্তানে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তখন পঞ্চায়েত ছিল না, ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। তিনি প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে ১৯৪১ সালের জণগননার তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছিলেন সেটা তৎকালীন ইংরেজ সরকারও সেটা অস্বীকার করতে পারেনি। তাই বঙ্গ ভাগ হয়ে রক্ষা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে বাংলাদেশে সেখানকার মিঞাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, নিজেদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের নৃশংসভাবে মরতে দেখে আর নিজেদের অপহৃতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পেরে নিজেরা জীবন রক্ষার্থে রাতের অন্ধকারে, একবস্ত্রে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় সীমান্ত পেরিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। তাদের বর্তমান প্রজন্ম এখন মার্কসবাদী হয়ে বিভিন্ন মিছিলে, মিটিঙে আওয়াজ তুলছে বাংলা ভাগ করল কে, শ্যামাপ্রসাদ আবার কে? সেদিন বঙ্গ ভাগ না হলে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা তোমাদের পূর্বপুরুষরা সেদিন কোথায় আশ্রয় পেত, সে প্রশ্ন আর মনে জাগছে না। হায় অকৃতজ্ঞ, বাঙ্গালি তোমাদের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী!

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়স,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে ভাবনা

সঞ্জয় বাড়ুই

শিক্ষা হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রথাগত শিক্ষা যে চারটি মূল চাকার উপর চলছে বা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বয়ে নিয়ে চলেছে সেগুলি হলো— ১. শিক্ষক, ২. ছাত্রছাত্রী, ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪. পাঠ্যক্রম। বর্তমানে এই চারটি চাকার অবস্থা আমাদের রাজ্যে কী আছে অর্থাৎ তারা কতটা বেগে আমাদের রাজ্যের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখা যাক।

শিক্ষক : শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূল ভূমিকা হলো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। বর্তমানে স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধই বলা যায়। বিদ্যালয়গুলিতে শূন্য পদ প্রচুর। ৬০ বছর পূর্ণ হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবসর নিতেই হয়। তাই শূন্য পদ বেড়েই চলেছে। সেই ফাঁকা স্থানে নতুন টিচার নিয়োগ হচ্ছে না। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য বেকার যুবক-যুবতী প্রচুর সংখ্যায় অপেক্ষা করে আছেন। রাস্তায় আন্দোলন করছেন, তাদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু সরকার শিক্ষক নিয়োগ করছেন না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের উপর চাপ বাড়ছে। বর্তমান সিলেবাসে একজন কলা বিভাগের শিক্ষক বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়ে অষ্টম-নবম শ্রেণীর নীচেও পড়াতে পারেন না ঠিকমতো। এই রকম সমস্যা স্কুলগুলিতে রয়েছে। টিচারদের মধ্যে দলাদলি, সদ্‌ভাবের অভাব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর প্রভাব পড়ছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব বিদ্যালয়গুলিতে বহুদিন ধরে রয়েছে। এই মানসিকতা শিক্ষা পরিবেশের ব্যাঘাত ঘটায়। শিক্ষকদের রিফ্রেসার ট্রেনিং প্রয়োজন, যা এখন হচ্ছেই না। প্রত্যেক টিচারকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন না হলে যুগের সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : গ্রামাঞ্চলের স্কুলের পরিকাঠামো সব জায়গায় ভালো নেই। অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ভালো ব্ল্যাকবোর্ড নেই যেটা ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন। ক্লাসরুমের সংখ্যায় কোথাও কোথাও কম। এখনো সরকারি বিদ্যালয়ে বাথরুম, ইউরিনাল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

ছাত্র-ছাত্রী : সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চমেধার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। মধ্যমেধা ও নিম্নমেধার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। বিদ্যালয়গুলিতে শৃঙ্খলা আগে থেকেই অনেকাংশেই কম, তাছাড়া উপস্থিতির হারও কমছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মিড্ ডে মিল, পোশাক, সাইকেল ইত্যাদি বিতরণ ব্যবস্থা দেখার জন্য শিক্ষকদের অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এইসব কাজ শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

পরিচালন ব্যবস্থা : বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য থাকে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও স্টাফ কাউন্সিল। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি নেই, প্রশাসক দিয়ে চালানো হয়। গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালন সমিতি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সুদক্ষ, সৎ, নিরপেক্ষ ও জ্ঞানী প্রধান শিক্ষকরা পারেন একটা বিদ্যালয়ের সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে। তাই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাকে বিশেষ করে প্রাধান্য দিলে তা সহায়ক হতে পারে।

পাঠ্যসূচি : বিদ্যালয় শিক্ষায় পাঠ্যসূচি আধুনিক হওয়া প্রয়োজন। যে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর জীবনে চলার পথে কাজে লাগবে, জীবন গঠনে কাজে লাগবে সেই রকম হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যসূচির মধ্যে দেশীয় মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশভক্তি, সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ব বোধ তৈরি দৃষ্টি সহকারে দিয়ে করা উচিত। পাঠ্যসূচি নির্ধারণে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ বিদ্যালয়গুলিতে লাগু করলে তা যুগোপোযোগী এবং জীবন গঠনের সহায়ক হবে। □

এই গরমে দু-মিনিটে রকমারি খাবার

সুতপা বসাক ভড়

আমরা বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি। যে কোনো ক্ষেত্রে ভালো পরম্পরাকে সরিয়ে রেখে তুলনামূলক কম ভালো অথবা খারাপ প্রথাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কতগুলো নেতিবাচক অভ্যেসের দাসে পরিণত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কিছু অসৎ ব্যবসায়ী আমাদেরকে তাদের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখতে চাইছে এবং আমরা জ্ঞানে-অজ্ঞানে তাদের অঙ্গুলিহেলনে জীবনযাপন করে চলেছি। ফলস্বরূপ, শরীর-মন উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ছে; উদাহরণস্বরূপ আমাদের খাদ্যাভ্যাস। এখনও পর্যন্ত দুপুরে ও রাত্রে আমরা পারম্পরিক খাবার খেতেই অভ্যস্ত, কিন্তু আমাদের জলখাবারে ভিন্‌দেশীয় খাবার অনেকটাই ঢুকে পড়েছে।

একটি খাবার যা মাত্র দু-মিনিটে তৈরি হয়, এমন কথা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কয়েকযুগ আগে আমাদের দেশে আসে। আমরা অনেকেই এর দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছি। ওই কোম্পানির দেখাদেখি আরও অনেক কোম্পানি নানারকম চট্‌জলদি খাদ্যসম্ভারে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ওই কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্মকে অসহিষ্ণু হতে শেখাচ্ছে এবং মায়েদের প্রভাবিত করছে, তাঁরা যেন অবিলম্বে সন্তানদের বায়না মেটান। একদিকে আগামী প্রজন্মকে করে তুলছে অধৈর্য এবং অপরদিকে মায়েদের অহেতুক প্রশ্রয়দাত্রীরূপে চিহ্নিত করছে। ওই বিজ্ঞাপনের প্রভাব সমাজে দেখা যাচ্ছে এবং ওই প্যাকেটজাত খাবারগুলি আমাদের শরীর-মনকে দুর্বল করে তুলছে।

কম সময়ে তৈরি হয় এমন রকমারি খাবার আমাদের ভাণ্ডারে অনেক আছে। কতগুলি খাবার দুমিনিটের থেকেও কম সময়ে তৈরি হয়, যা টাটকা, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর; যেমন : ১. **দুধ-মুড়ি** : দুধে গুড়, কলা, মুড়ি মিশিয়ে খেলে একটি অতি উপাদেয় জলখাবার। ২. **দুধ-খই :** একই রকমভাবে দুধে গুড়, কলা, আম, খই ইত্যাদি মিশিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। ৩. **মুড়ি-মুড়কি** : একটি সুস্বাদু, পুষ্টিকর দেশীয় খাবার। ৪. **মুড়িমাখা :** একবাটি মুড়িতে কাঁচা তেল, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজকুচি, সঙ্গে ছোলা-বাদাম,

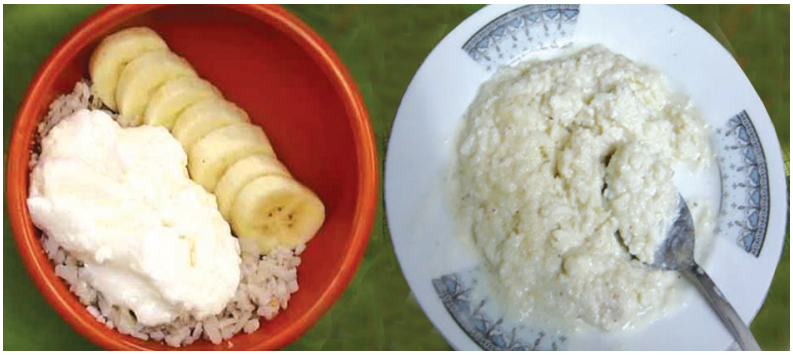

আলুভাজা অথবা যে কোনো শুক্‌নো তরকারি দিয়ে খেতে খুবই মুখরোচক। ৫. **দই-চিড়ে :** চিড়ে ভালো করে ধুয়ে, গুড় বা বাতাসা ও দই দিয়ে মেখে তাতে কলা বা আম দিয়ে খাওয়া যায়। ৬. **দুধ-চিড়ে :** উপরোক্ত পদ্ধতি, শুধু দইয়ের পরিবর্তে দুধ দিয়ে খাওয়া যায়, ৭. **কাশীর চিড়ে :** পাতলা চিড়ে শুকনো অবস্থায় ভালো করে পরিষ্কার করে, একটু ঘি, নারকেল কোরা, গুড়, কর্পূর অথবা ছোটো এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দশ মিনিট আগে মেখে রাখলে একটি অতীব সুস্বাদু জলখাবার প্রস্তুত হয়। ৮. **সাবু-মাখা :** দু-ঘণ্টা আগে ভালো করে ধুয়ে দলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। খাবার সময় জল ঝরিয়ে, এতে দই, গুড় অথবা বাতাসা, কলা বা আম দিয়ে মেখে খেতে খুব ভালো লাগে। এতে গন্ধরাজ লেবুর কয়েক ফোঁটা রস দিলে আরও সুগন্ধিত হয়ে ওঠে। ৯. **ছাতুর শরবত :** ভালো ছাতু, টকদই একসঙ্গে মিশিয়ে একটু গুড়, লেবুর রস দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে তৈরি ছাতুর শরবত। ছাতুর শরবত খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। অতি পুষ্টিকর এবং এই গরমে শরীরও ঠাণ্ডা রাখে। ১০. **রায়তা :** বাড়িতে পাতা দইয়ে আলু সেদ্ধ, শশা বা অন্যান্য ফল ছোটো করে কেটে বিটনুন, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে একটি অতি সুস্বাদ জলখাবার প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত খাবারগুলি আমাদের নিজস্ব খাবার। এগুলিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। এই গ্রীষ্মের দাবদাহে শরীর ঠাণ্ডা রাখে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। এগুলি তৈরি করার জন্য সবসময় মায়েদের গ্যাসের কাছেও যেতে হয় না। পাখার নীচে বসে তৈরি করা যায়। এরকম অনেক টাটকা, পুষ্টিকর জলখাবার সরিয়ে রেখে আমরা কতদিনের পুরানো, অস্বাস্থ্যকর প্যাকেটের খাবার আমাদের সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছি এবং নিজেরাও খাচ্ছি। ফলস্বরূপ, বয়স নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকার হয়ে পড়ছি। ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে, তিনি ওষুধ দেবেন, সেই ওষুধ খেয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারূপে আরও অসুখ আসতে থাকে। সুতরাং আমরা যদি বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমাদের পারম্পরিক খাবারগুলো গ্রহণ করি, তাহলে আমরা একটি সুস্থ পরিবার, সমাজ ও দেশ পাব।

বিদেশি অর্থলোভীদের চক্রান্তের শিকার না হয়ে একটু নিজেদের রান্নাঘরের দিকে ফিরে তাকাব, দেখব যেখানে আছে আমাদের স্বাদ, সাধ ও সুস্বাস্থ্যের ভাণ্ডার। □

প্রস্রাবে ফেনা
ভালো লক্ষণ নয়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

মল-মূত্র শরীরের বর্জ্য পদার্থ। যার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান বেরিয়ে যায়। মূত্রের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদানও শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই যে কোনও রোগের চিকিৎসা করাতে গেলে মূত্রের ধরন কেমন সেটা দেখা হয়।

প্রস্রাবে ফেনা মাঝে মধ্যে হতে পারে, যা স্বাভাবিক। অনেক সময় খুব গতিতে মূত্র ত্যাগ করলেও ফেনা হয়। এটা নিয়ে চিন্তার নেই। কিন্তু স্বাভাবিক গতিতেও মূত্র ত্যাগ করার সময় যদি দেখা যায় অতিরিক্ত ফেনা হচ্ছে তাহলে কিন্তু চিন্তার বিষয়।

প্রস্রাবে ঘনত্ব যেমন শরীরে জলের অভাব হলে হয়। প্রস্রাবে বুদবুদ আর ফেনা এক নয়। বুদবুদ অনেক বড়ো, পরিষ্কার হয় ও ফ্লাশ করলে চলে যায়। অন্যদিকে ফেনা হলে তা কিন্তু প্রস্রাবের পর জল দিলেও যায় না। তখন সতর্ক হতে হবে।

কেন এমন হয়?

যদি প্রস্রাবে প্রায়শই ফেনা হয় বা ফেনার মাত্রা সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে তাহলে তা রোগের লক্ষণ। কিডনির রোগে যখন প্রস্রাবে প্রোটিন বেরিয়ে যায় তখন ফেনা হয়। এটি কিডনি রোগের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। যদি প্রস্রাব অধিকাংশ সময়ে ফেনাযুক্ত হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্রাবের পরীক্ষা করতে হবে। যদি প্রস্রাবে প্রোটিন থাকে তাহলে আরও নানা পরীক্ষা করে দেখতে হবে কেন প্রোটিন বেরোচ্ছে।

রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন, অর্থাৎ পুরুষদের বীর্য মূত্রথলিতে গিয়ে জমা হলে, সেক্ষেত্রেও প্রস্রাবে ফেনা হয়, যদিও এই ঘটনা খুব বিরল। সাধারণত কিডনি যখন রক্ত পরিষ্কার করে, তখন প্রোটিন প্রস্রাবে আসে না। কিডনির ফিলটারের ছিদ্র বড়ো মাপের হলে প্রোটিন বের হয়ে যায় এবং তা বাতাসের সঙ্গে ক্রিয়া করে মূত্রে ফেনার সৃষ্টি করে। প্রোটিন নির্গমনের পরিমাণ যত বেশি হবে কিডনির ক্ষতি তত বেশি ও দ্রুত হতে পারে।

প্রস্রাবে ফেনা এবং আরও উপসর্গ :

- সারা শরীর ফুলে যায়, মুখ, হাত, পা ফোলে।
- দুর্বলতা দেখা দেয়।
- খেতে অনীহা ও অরুচি।
- বমিভাব বা বমি হওয়া।
- প্রস্রাবের পরিমাণ কম হওয়া।

কী কী কারণে কিডনি থেকে প্রোটিন বেরোতে পারে?

- মধুমেহ বা ডায়াবেটিস জনিত কিডনির রোগ।
- উচ্চরক্তচাপ থেকে কিডনির রোগ হলে।
- নেফ্রোটিক সিনড্রোম।
- ক্রনিক গ্লোমেরিউলো নেফ্রাইটিস।

রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন যে যে পরিস্থিতিতে হতে পারে।

- মধুমেহ।
- প্রস্টেট অপারেশনের পর বা প্রস্টেট বড়ো হলে যে ওষুধ দেওয়া হয় তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য।
- শিরদাঁড়ার কোনও আঘাত থেকে নার্ভ নষ্ট হলে।
- উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খেলে।

কী টেস্ট করাতে হবে?

- ২৪ ঘণ্টায় প্রস্রাবে কতটা প্রোটিন বেরোচ্ছে তা দেখতে হবে।
- র‍্যানডম ইউরিন স্যাম্পলে অ্যালবুমিন ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রার অনুপাত।
- প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রার অনুপাত দেখা।

ধীরে ধীরে কিডনির কার্যক্ষমতা কমতে থাকে এবং একসময় কিডনি ফেল করে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ চিহ্নিত হলে তার চিকিৎসা সম্ভব।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

- প্রস্রাবের ফেনা যদি কয়েকদিন পরেও না যায়।
- প্রস্রাবে ফেনার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকলে।
- প্রস্রাব যদি ঘোলাটে বা লালচে হয়।
- পুরুষদের যদি বীর্যপাত কম হয় বা না হয়।

লক্ষণ হিসেবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। □

ডাকটিকিটে মা গঙ্গা ও ডাকবিভাগের গঙ্গাজল প্রকল্প

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গানদীকে তুলে ধরে ডাকবিভাগ বিভিন্ন সময় ডাকটিকিট ও কভার প্রকাশ করেছে। ডাকটিকিটের বিষয়ে উৎসাহীদের জন্য ফিলাটেলি বিভাগে সেই ডাকটিকিটের সংগ্রহ রক্ষিত আছে। বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে 'ঘাটস্ অব বারাণসী' (বারাণসীর ঘাট) শীর্ষক ডাকটিকিট প্রকাশ হওয়ার পর 'গঙ্গা : দ্য রিভার অব লাইফ' বা 'গঙ্গা : জীবনদায়িনী নদী' শীর্ষক ডাকটিকিটটি ১৯৯০ সালে প্রকাশ করে ডাকবিভাগ। ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় 'বারাণসী সিটি' বা 'বারাণসী শহর' শীর্ষক একটি ডাকটিকিট। ২০২৩ সালে ভারত- মিশর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দেশের এই অটুট, অচ্ছেদ্য দ্বিপাক্ষিক বন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ পুণ্যতোয়া, প্রবহমান গঙ্গাকে তুলে ধরে 'দ্য গ্যাঞ্জেস্' বা 'গঙ্গা' শীর্ষক একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে ডাকবিভাগ। এছাড়াও লুপ্তপ্রায় জলজ প্রাণী ডলফিনকে সংরক্ষণের বার্তা দিয়ে ১৯৯১ ও ২০০৯ সালে যথাক্রমে 'রিভার ডলফিন' ও 'গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন' বা 'গঙ্গার ডলফিন' শীর্ষক দুটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

২০১৬ সালের ১০ জুলাই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ডাকবিভাগের মাধ্যমে গঙ্গাজল সরবরাহ প্রকল্প শুরু করেন। গঙ্গাজল প্রাত্যহিক পূজার্চনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। দক্ষিণ ভারতেও গঙ্গাজলের চাহিদা প্রচুর। গঙ্গা হতে দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে ভারতের দক্ষিণাংশে গঙ্গাজল অপ্রতুল। এই চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সারা দেশে ডাকঘরের মাধ্যমে গঙ্গাজল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। প্রথম পর্যায়ে গঙ্গোত্রী ও হৃষীকেশ থেকে সংগৃহীত গঙ্গাজল বটলিং বা বোতলজাত করে ২০০ মিলিলিটার ও ৫০০ মিলিলিটারের বোতল হেড পোস্ট অফিসগুলির মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। সেই সময় হৃষীকেশ থেকে সংগৃহীত ২০০ ও ৫০০ মিলি গঙ্গাজলের বোতলের মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ২২ টাকা। গঙ্গোত্রী থেকে সংগৃহীত ২০০ ও ৫০০ মিলি গঙ্গাজলের মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৩৫ টাকা।

ডাকঘরের মাধ্যমে গঙ্গাজল সরবরাহ প্রকল্পে অভাবনীয় সাফল্য আসে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরবরাহ শুরু হওয়ার দু-তিনদিনের মধ্যেই গঙ্গাজলের সমস্ত বোতল বিক্রি হয়ে যায়, অনলাইনেও অনেকেই সরাসরি অর্ডার দেন যা ডাককর্মীদের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে পৌঁছে যায়। প্রায় আটবছর অতিবাহিত হওয়ার পর এখনও গঙ্গাজলের যা চাহিদা তার তুলনায় ডাকঘরে গঙ্গাজলের সহবরাহ অনেকটাই কম। সময়ের সঙ্গে দামও একটু বেড়েছে। ডাকঘরের মাধ্যমে এখন মূলত ২০০ মিলিলিটারের গঙ্গাজলের বোতল সরবরাহ করা হয় যার মূল্য ৩০ টাকা। দেশজুড়ে সুলভে গঙ্গাজল সরবরাহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত এবং ডাকঘরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'গঙ্গাজল প্রকল্প' সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সমাজের পবিত্র গঙ্গাজল সহকারে নিত্যপূজার ইচ্ছাপূরণে সহায়ক হয়েছে।

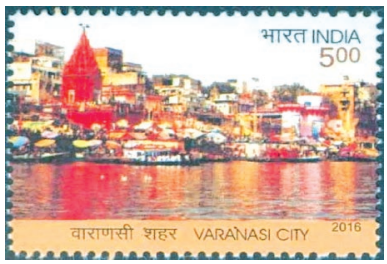

গঙ্গার উৎস সন্ধানে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

১. গঙ্গার উৎস সন্ধানে :

কবি 'গঙ্গার উৎপত্তি' শীর্ষক কবিতায় দেখিয়েছেন কীভাবে হিমালয়ের গোমুখ থেকে গঙ্গা তার সহস্র তরঙ্গকে একত্রে মিলিয়ে উৎপন্ন হয়ে এসেছে। হরিদ্বারে কীভাবেই-বা সমতলে পতিত হয়েছে সেই গঙ্গা। কবির কথায় গঙ্গার উৎপত্তি 'ব্রহ্মা কমণ্ডলে/জাহ্নবী উথলে/পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।' এই কমণ্ডলুতে কীভাবে জল এল? কবি লিখলেন, 'বিন্দু বিন্দু বারি/পড়ে সারি সারি/ধরিয়া সহস্র বেণী।' এই বারিরাশি গগনে গগনে গভীর গর্জন করে ভীম কোলাহলে মহাবেগে নেমে আসছে। নেমে আসছে রজত-কায়ায় বায়ু বিদারিত করে। যেখান থেকে এই বারিরাশি আছড়ে পড়ছে তা যেন ভূ ধর-শিখরের মুকুট; তা যেন সলিলরাশি সজ্জিত হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি শির! তা যেন অনন্ত গগনে রজত-বরণ স্তম্ভ। এরই চারিদিকে স্তূপাকার ধবল ফেনা। এই গিরিচূড়ার চারিদিক আবৃত হয়ে আছে হিমানীর গুঁড়ো। হিমানী থেকে সলিলকণা খসে খসে পড়ছে। হিমাদ্রিতে বইছে এমন সহস্র ধারা। পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে তারই তরঙ্গ। এই মহাবেগে ত্রিলোক আতঙ্কে কেঁপে উঠছে।

কবি হেমচন্দ্র লিখছেন, 'ছুটিল গর্বেতে/গোমুখী পর্বতে/তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি।/গভীর ডাকিয়া/আকাশ ভাঙিয়া/পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।' তারপর পালকের মতো পর্বত ছিঁড়ে, বাঁধ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, তরঙ্গ ছুটিয়ে, অসংখ্য কেশরী-নাদ ডেকে, বক্রাকার বেগে ধেয়ে আসছে স্রোতঃস্তম্ভ। যোজন অন্তর নীচে সেই জলস্তম্ভ পতিত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে সাদা ফেনরাশি। তার তরঙ্গ নির্গত জল প্রকৃতপক্ষে হিমানীর চূর্ণ, হিমরাশি আবৃত। গঙ্গার চিত্রিত রূপ যেন জলধনু। কবি লিখছেন, 'শত শত ক্রোশ/জলের নির্ঘোষ/দিবস রজনী করিছে ধ্বনি;/অধীর হইয়া/প্রতিধ্বনি দিয়া/পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।' এরপর দেখা যায় হরিদ্বারে নেমে এসেছে গঙ্গার বিমল ধারা; তার শ্বেত সুশীতল জল। পৃথিবী সেই পবিত্র জলে আনন্দে বিভোর। মর্ত্যবাসী সেই পতিত পাবনীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'অবনীমণ্ডলে/সে পবিত্র জলে/হইল সকলে আনন্দে ভোর;/জয় সনাতনী/পতিত পাবনী/ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।'

২. গঙ্গার মূর্তি ভাবনা :

রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গঙ্গার মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটিকে বিষয়বস্তু করে হেমচন্দ্রের একটি কবিতা 'গঙ্গার মূর্তি'। সে মূর্তি শ্বেতবরণা, সে মূর্তি শ্বেতভূষণা। মূর্তির বদনমণ্ডলে চন্দ্রবিভাস। দেবী শান্ত-নয়না, শান্ত-বদনা, প্রসাদ প্রতিমা।। দেবীর ওষ্ঠ-অধরে হিঙ্গুল রাগ। তাঁর শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠ। মূর্তির চতুর্ভুজ এইরকম— 'দক্ষিণ বামেতে/ঊর্ধ্ব দ্বিভুজ/স্বর্ণ কমল তায়,/অধঃ দুই ভুজে/দক্ষিণ বামেতে/করতলে ধৃত বর অভয়।' দেবীর চরণ-প্রতিমা রক্ত-রাজীবের মতো। দেবী শুভ্র মকরে আসীনা, 'রক্ত-রাজীব/চরণ-প্রতিমা/শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,/শান্ত-নয়না/শান্ত-বদনা/প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে!'

এরপরই প্রশ্ন তুলেছেন কবি। দেবী কি এই মর-ভবনে বসে আমাদের অভয় বর দেবেন? দেবী কি জীয়ন্ত-জীবনে আমাদের পরাণের জ্বালা জুড়াতে পারবেন? মানুষের ব্যথা কি তার হৃদিতেও ব্যথা জাগাবে? যদি জাগিয়েই থাকে, তবে তার এত প্রশান্ত মুখ কেন? মানুষের কলুষে তাপিত দুঃখ কি দেবতার পরাণে প্রবেশ করবে? শমন ডাকবার আগেই, পরানপাখি উড়বার আগেই কবি জানতে চাইছেন দেবী মূর্তির কাছে, কীভাবে পাপের পীড়নের পরেও ধরাতে রয়েছেন তিনি! কিন্তু তবুও দেবী নির্দয়, নিরুত্তর, মৌন, পাষাণ, অসাড়, অচেতন। কবি বলছেন, যদি তিনি মৃতই হবেন, তবে তার মুখমণ্ডলে কেন এত লাবণ্য? কেন জীবন-চন্দ্রমা? কেন সর্ব অঙ্গে রাকা? হতাশ কবি তাই লিখছেন, 'হায় রে পাষাণী,/পারিতাম যদি/দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,/জানিতে তা হলে/এ ভবমণ্ডলে/কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ!'

৩. গঙ্গার প্রবাহ :

'গঙ্গা' কবিতায় হেমচন্দ্র এক জীবনগঙ্গার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। গঙ্গার বয়ে চলার পথে নানান উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, নানান প্রাণীবৈচিত্র্য। 'শাল, পিয়াল, তাল,/তমাল, তরু, রসাল,/ব্রততী-বল্লরী-জটা-/সুলোল-ঝালর-ঘটা'। জলে পানিবক, মীনরাশি। জলের কোলে শঙ্খ, শুক্তি নিয়ে বেগবতী এই গঙ্গা। গঙ্গা প্রবাহ পথে শশধর-জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়। চারিদিকে পরিমল, বায়ুগন্ধ। গঙ্গার বিস্তৃত ধারার সঙ্গে ধরণীও যেন দুধারে নিবিড় রঙ্গে চলেছে। প্রফুল্ল করেছে নানান উদ্ভিদ ও কৃষিক্ষেত্র। ঘাটে ঘাটে ফুল ফোটে 'বট, বেল, নারিকেল,/শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,/অরণ্য, নগর, মাঠ/গবাদি-রাখাল-নাট'। গঙ্গার প্রবাহের পথে হর্ম্যপটের মতো মন্দির-দেউল-মঠ। গঙ্গার প্রবাহে নগর পল্লীর সুখ। ধবল ধীর তরঙ্গস্রোতে ভেসে চলে বাণিজ্য-বেসাতি-পোত। গঙ্গার বুকে খেলা করে তরি-ডিঙ্গা-ডোঙ্গা-ভেলা।

কবি লক্ষ্য করেছেন তবুও কোথায় যেন মহাভারতের সঙ্গে বঙ্গ চিত্রের প্রভেদ। যেখানে কবি বলছেন, 'পবিত্র তোমার জল,/পবিত্র ভারত-তল;/সর্ব দুঃখবিনাশিনী,/সর্ব পাপসংহারিণী/'; যেখানে তাঁর কাব্যে গঙ্গা পতিতপাবনী, পুণ্যতোয়া, বিষ্ণুপদী; যেখানে গঙ্গার তিলোদক অমৃত বলে গায়ে ঢাললে দেহাঙ্গন মুক্ত হয়, মুক্ত হয় সর্বপাপ; যেখানে গঙ্গা ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফলের কথা বলে; যে গঙ্গার পরহিত-চিন্তা-ব্রত; সেই গঙ্গাই যখন বঙ্গপথে বয়ে চলে, তখন তাঁর নরনারী যেন জীবন-সংগীত-হীন! কিন্তু কেন? কবি আশা প্রকাশ করে বলেছেন বঙ্গের চিন্তার সদর্থক ধারা যেন গঙ্গার ধারার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়! ঘুচে যায় এই বঙ্গ-চিত্তের কারা। গঙ্গার প্রবাহে যে সামগ্রিক জীবের বসবাস, তাদের যেন দেবী উদ্ধার করেন। ■

গঙ্গা দূষণ এবং তার প্রতিকার

শাওন ব্যানার্জী

'বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, 'আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।' কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অনুপ্রমাণ শক্তির মিলনে অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল।'

—'মহাদেবের জটা' হতে যার উৎপত্তি, যে নদী পৃথিবীর দেহ নতুন করে নির্মাণ করেছে, যে নদী আমাদের পূজ্য, অগণিত ভারতবাসীর আবেগ, সেই নদীর জলকণা দূষিত হলে এককালে মানবজীবনের অস্তিত্ব প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়াবে। পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত দশটি নদীর মধ্যে গঙ্গা অন্যতম। সত্তরের দশক থেকে ভারতবাসী গঙ্গার দূষণ নিয়ে বলতে বা ভাবতে শুরু করেছে, যদিও এই দূষণ শুরু হয়েছিল বহুকাল আগে থেকেই। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটারের দীর্ঘ যাত্রাপথে গঙ্গার ধারে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শহর ও জনপদ। সমগ্র গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় নয় লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এই অববাহিকায় গড়ে উঠেছে ২৯টি প্রথম শ্রেণীর শহর, যার প্রতিটির লোকসংখ্যা এক লক্ষের অনেক বেশি। গঙ্গার দু'পাশের বাসিন্দাদের বর্জ্যই গঙ্গাদূষণের জন্য মূলত দায়ী।

অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, গঙ্গার আশেপাশের কলকারখানা গঙ্গা দূষণের মূল কারণ। কিন্তু এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মানুষের সৃষ্ট বর্জ্যপদার্থ থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ দূষণ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ১০০ মিলিলিটার জলে ১০০০ কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া হলো গ্রহণযোগ্য মাত্রা। কিন্তু পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গায় ১০০ মিলিলিটার জলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া আছে। এই তথ্য থেকে দূষণের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন খাল-নালা, খোলা নর্দমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন গ্যালন আবর্জনা ও তরল বর্জ্য গঙ্গার জলে এসে পড়েছে। এই তরল আবর্জনার মধ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও আছে। উত্তরপ্রদেশের ৬৮৭টি ও উত্তরাখণ্ডের ৪২টি কারখানার মধ্যে মোট ৪৪৪টি চর্ম-শিল্পের কারখানা আছে। মোট ৬৩টি কারখানায় কাপড় রং করা হয়। এই সমস্ত কলকারখানা থেকে প্রতিদিন ২৬৯ মেগালিটার তরল-বর্জ্য গঙ্গায় এসে পড়ে।

তুলনামূলক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের দূষণ সৃষ্টিকারী কলকারখানার সংখ্যা অনেক কম, মাত্র ২২টি, যা থেকে প্রতিদিন ৮৭ মেগা লিটার তরল-বর্জ্য গঙ্গায় পড়ে (সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোলবোর্ডের রিপোর্ট থেকে গৃহীত তথ্য)। তাই জৈব-বর্জ্যের সঙ্গে সঙ্গে লেড-নিকেল- কপার-জিংক জাতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিকও গঙ্গার জল দূষিত করছে।

কিন্তু দূষণ রোধের উপায় কী? প্রথমেই প্রতিটি পৌরসভাকে আধুনিক পদ্ধতিতে শহরের ময়লা শোধন করতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে নর্দমা বা খাল-বাহিত ময়লা জল গঙ্গায় না পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে পরিমিত ওষুধ দিতে হবে, কলকারখানাগুলির নিজস্ব পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সরকারি সহায়তায় সাতটি আইআইটি-কে নিয়ে 'Ganga River Basin Management Plan (GRBMP)' গড়ে উঠেছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৮১৫টি 'Sewage Treatment Plant (STP)' গড়ে উঠেছে গঙ্গাজল শোধনের জন্য। তবু সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হন, যদি দূষণ প্রতিরোধের সমস্ত প্রকল্প কাগজ-কলমেই আটকে থাকে, তাহলে গঙ্গার শুদ্ধ-স্বচ্ছ রূপ দেখা স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে। ■

হিন্দু জীবনচর্যায় রয়েছে গঙ্গাস্নানের রীতি ও পরম্পরা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, মা—
শ্যামবিটপীঘন তট-বিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।।'

—এই দ্বিজেন্দ্রগীতির মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে শাশ্বত নদীমাতৃক ভারতবর্ষের নদীকেন্দ্রিক মানব-সভ্যতার বিবরণ ও আখ্যান। আবহমান কাল ধরে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্ভূত অখণ্ড সভ্যতা-সংস্কৃতিগত যে সত্তা অর্জন করেছে তাই হলো হিন্দুত্ব। যুগ-যুগান্তরে ভারতীয় ঋষিদের যে সাধনা, সেই সাধনাই আপামর ভারতীয়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হতে মানসিক ঐক্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে, ভারতবর্ষকে পরিণত করেছে দেবভূমিতে। তাই পূজার্চনায়, পারলৌকিক ক্রিয়ায়, সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং স্নান করার সময় নদীস্তোত্র পাঠ, ভারতবর্ষের প্রাণ-স্বরূপিণী নদীসমূহের মন্ত্র জপের প্রচলন চিরন্তন।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
এই স্তোত্র জপের পর কৃতাঞ্জলি হয়ে জপ করা হয়—
ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্কবাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ।।

গোটা বছর ধরেই হিন্দুর জীবনচর্যায় গঙ্গাস্নানের রীতি ও পরম্পরা রয়েছে। নির্দিষ্ট তিথি, নক্ষত্র ও বিশেষ যোগযুক্ত দিনক্ষণে গঙ্গাস্নানের রয়েছে শাস্ত্রবিহিত পুণ্যফল। এই স্নানমাহাত্ম্যের কারণে হিন্দুর চিরকালীন আধ্যাত্মিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে রয়েছে গঙ্গাস্নান। পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের শুভ সূচনা। এই বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া বা রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে গঙ্গাস্নানে অক্ষয় ও অনন্তপুণ্য প্রাপ্তি হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার পরেই বৈশাখী শুক্লাসপ্তমী বা জহ্নুসপ্তমীতে গঙ্গাস্নানে অন্যান্য দিনের গঙ্গাস্নান অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হয়। এই বছর (১৪৩১ বঙ্গাব্দে) ৩১শে বৈশাখ জহ্নুসপ্তমী তিথির স্থিতি পরের দিন পয়লা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত থাকার দরুন পয়লা জ্যৈষ্ঠও জহ্নুসপ্তমীতে গঙ্গাস্নান করলে পরিণাম শতগুণ ফলপ্রাপ্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে গঙ্গা দশহরা বা গঙ্গা দশমী উদ্‌যাপিত হয়। সনাতন ধর্মের আখ্যান অনুযায়ী, এই দশমী তিথিতেই দেবাদিদেব শিবের জটা হতে মর্ত্যলোকে অবতরিত হয়েছিলেন গঙ্গা। এই হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে গঙ্গাস্নানের দ্বারা 'দশজন্মার্জিত দশবিধপাপক্ষয় ফললাভ' অর্থাৎ দশ জন্মের দশ ধরনের পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়। এই তিথিতে সকালে গঙ্গাস্নান অত্যন্ত শুভ। গঙ্গাস্নানের পর সুপুরি, আম, জল ভর্তি কলস, ছাতু, মরশুমি ফল, গুড়, হাত পাখা, ছাতা, বেদানা, নারকেল, কলা, তরমুজ দরিদ্রদের দান করা শ্রেয়। এহেন দানের ফল অক্ষয় পুণ্য লাভ এবং ধন-সমৃদ্ধি। পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ থাকলে গঙ্গাস্নান করার পর গঙ্গা স্তোত্র পাঠ অবশ্য করণীয়। গঙ্গা স্তোত্র পাঠের পর— 'বৃহত্যৈ তে নমোস্তুতে লোক ধাত্র্যৈ নমোস্তুতে। নমস্তে বিশ্বমিত্রায় নন্দিন্যৈ তে নমো নমঃ'।। মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করার পর গঙ্গার ধারে বা কোনো শিবমন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গের অভিষেকের প্রয়োজন। যে জল দিয়ে অভিষেক করা হয়েছে, তা বাড়ি নিয়ে এসে সব ঘরে ছিটালে পরিবারের অসুস্থ সদস্যের আরোগ্য লাভ হবে।

দশহরার পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের চম্পক দ্বাদশী বা শ্রীরাম দ্বাদশী তিথিতে যমুনা নদীতে স্নান ও পিণ্ডদানে বিশেষ ফল লাভের মাহাত্ম্য বর্ণিত রয়েছে। তারপরে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানে সর্বপাপক্ষয় ফল এবং স্নানের পর পুরুষোত্তম দর্শনে একবিংশতি কুলোদ্ধারণ, বিষ্ণুলোক গমন ফল ও অক্ষয়পদ প্রাপ্তি লাভ নির্দেশিত রয়েছে। শ্রাবণ মাসে ব্যতীপাতযোগে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধারণ ফল লাভ হয়। ভাদ্র মাসে অক্ষয়ষষ্ঠী তিথিতে গঙ্গাস্নানে অক্ষয় পুণ্যফল অর্জিত হয়। আশ্বিন মাসে অমাবস্যায় গঙ্গাসমীপে মহালয়া পার্বণশ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ অবশ্য কর্তব্য। প্রেতপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধ, তিলতর্পণ ও পিণ্ডদান সমাপনের মাধ্যমে পিতৃপক্ষের অবসান। কার্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যার আগে চতুর্দশী তিথিতে চতুর্দশ যমতর্পণে গঙ্গায় দিবাস্নানের শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে। অমাবস্যা তিথি অতিবাহিত হলে দ্যুতপ্রতিপদে গঙ্গাস্নানে শতগুণ ফললাভ হয়। এরপরে কার্তিক মাসের শেষে রাসপূর্ণিমার পর রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাপ্রতিপদ তিথিতে গঙ্গাস্নানে 'বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল'-এর সমান ফল লাভ হয়।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিতে ভোরবেলায় মকরস্নান

হিন্দুশাস্ত্র নির্দেশিত এক পরমার্থিক নির্দেশ। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান এবং মহর্ষি কপিলের আশ্রম দর্শন লাভ হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনাকে করে পূর্ণ। চূড়ামণিযোগে সাগর স্নান এবং এই যোগে সূর্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের প্রাপ্তি অসীম পুণ্যফল। এই বছর মকর সংক্রান্তিতে এবং তারপরে মাঘ মাসে প্রয়াগে এই বছর অনুষ্ঠিতব্য কুম্ভমেলায় মহাকুম্ভ স্নান ও শাহি স্নান আপামর হিন্দুর এক অবশ্য ধর্মীয় কর্তব্য। মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশী স্নানের ক্ষেত্রে মৃত্যুপরিত্রাণ কামনায় গঙ্গাস্নান কর্তব্য এবং স্নানের পর চতুর্দশ যমতর্পণ বিধেয়। এই মাসেই মাকরী বা মাঘী সপ্তমী স্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফলের সমান ফল লাভ এবং তারপরে মহানন্দানবমীতে গঙ্গাস্নানে অক্ষয় পুণ্যফল লাভ হয়।

ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশী বা গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রযোগে গঙ্গাস্নানে মহাপাতক পাপক্ষয়ের ফল লাভ হয়। শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী, 'গোবিন্দদ্বাদশীস্নানম্, অত্র মহাপাতক পাপক্ষয় কামনয়া গঙ্গায়াং স্নাতব্যম্'। এই তিথিতে গঙ্গাস্নানের বিশেষ মন্ত্র— 'মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে। গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্যতানি মে হর জাহ্নবি।।' চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্রযোগে বারুণী গঙ্গাস্নানে কোটি সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফলের সমান ফল লাভ হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গঙ্গায় 'মহাবিষুব সংক্রান্তি স্নান'-এর শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে।

বারো মাসে এই বিশেষ গঙ্গাস্নানের নিয়ম ছাড়াও বারোটি মাসের প্রতিটি পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানের বিধি রয়েছে। পয়লা বৈশাখ, ভাদ্র ও পৌষ মাসে মৌনী অমাবস্যা-সহ বিভিন্ন দিনে ও তিথিতে অক্ষয়াস্নানের বিধি রয়েছে। পূর্ণিমাস্নান ও অক্ষয়াস্নান ছাড়াও সারা বছরের বিভিন্ন তিথিতে মন্বন্তরাস্নান, ত্র্যহস্পর্শস্নান, যুগাদ্যাস্নান, পুণ্যতরাস্নান, গোসহস্রীযোগস্নান, অহোরাত্রস্নান ও সংক্রান্তিস্নানেরও শাস্ত্রনির্দেশিত বিধান রয়েছে।

অক্ষয় পুণ্যফল লাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাস্নানের ব্রত মানব জীবনের মহতী সাধনার অংশ স্বরূপ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মা গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই নদীপারে বিকশিত মানব সভ্যতা আবর্তিত। গঙ্গামাটি মেখে কাঠামোতে লেপন করেই দেবীপ্রতিমা গড়ার মধ্য দিয়েই জগজ্জননীর পূজার্চনার সূত্রপাত। পূজার শেষে সেই গঙ্গাতেই দেবীর বিসর্জন। মা গঙ্গা ভারতের বুকে চিরপ্রবাহিত না হলে হয়তো অনুর্বর-ঊষর এক ভূমিখণ্ডের সাক্ষী থাকতো এই পৃথিবী। অসংখ্য উচ্চকোটির সাধকের সিদ্ধিলাভের পীঠস্থান এই গঙ্গার তীর। জলই জীবন। পতিতপাবনী সুরধনী ভারতের বুকে শুধুমাত্র জলসিঞ্চন করেননি, তিনি সনাতন ভারতবর্ষের নদীতীরে বিকশিত সব সভ্যতার প্রাণস্পন্দনস্বরূপা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন—

'পরিহরি ভব সুখ-দুঃখ যখন মা— শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধুনী কল কল্লোলিনী গঙ্গে।।'

মৃত্যুর আগে অন্তর্জলি যাত্রার মতো কুপ্রথা হিন্দুসমাজ থেকে বিলুপ্ত হলেও মৃত্যুর পর মৃতদেহকে গঙ্গাতীরের শ্মশানেই দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। গঙ্গাবক্ষেই বিসর্জিত হয় শবদাহের পর চিতাভস্ম। প্রতিবার গঙ্গাস্নান যেন প্রতিটি ভারতীয়কে, প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় গঙ্গাপুত্র দেবব্রত— পিতামহ ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠ আদর্শ, বলিষ্ঠ মনোভাব, তাঁর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, তাঁর অটুট সংকল্প, তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বঙ্গভূমিতে পুণ্যতোয়ায় অবগাহনের মাধ্যমে হৃদয়ে জাগ্রত মা গঙ্গার প্রতি এই ভক্তি ও সমর্পণের ভাবই হোক বাঙ্গালি জীবনের পরমার্থিক উপজীব্য।

বঙ্গ সাহিত্যে গঙ্গা

মিলন খামারিয়া

বাংলা সাহিত্যে কিছু কবিতা এমন রয়েছে যেখানে গঙ্গাই মূল থিম। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'। আবার কোথাও, কোনো কথাসাহিত্যে আবহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গঙ্গানদীর অবতারণা রয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প 'ঘাটের কথা'। বঙ্গভূমিতে গঙ্গার নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা অঞ্চলের কীরূপ অবস্থান, তার একটি উদাহরণ পাই রজনীকান্ত সেনের গানে, যেখানে উত্তরে অভ্রভেদী অলঙ্ঘ্য গিরি হিমালয়, দক্ষিণে জলধি বঙ্গোপসাগর এবং তারই মাঝে জাহ্নবী গঙ্গার উপনদী শাখানদী প্রবাহিত পলি- নুড়ি-পাথরের আবহবিকারের মাধ্যমে সুগঠিত গাঙ্গেয় শস্যক্ষেত্র।

'নমো নমো নমো জননি বঙ্গ!
উত্তরে ওই অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল-ধৌত
শ্যাম-ক্ষেত্র-সঙ্ঘ।'

'দুই বিঘা জমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরের ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে স্নিগ্ধ সমীরে জুড়ানো প্রাণে এক বঙ্গগ্রামের চিত্রকল্পের উল্লেখ করেছেন,

'নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।'

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর গানে যে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, তার তট শ্যামবিটপীঘন। গঙ্গার যে ধূসর তরঙ্গ শত শত যুগ ধরে বয়ে চলে, তার কূলে কূলে নগর-নগরী ও তীর্থক্ষেত্র। তার জলে অবগাহন করে ধন্য হয় অসংখ্য নর-নারী।

'কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বী চরণ যুগমায়ী
কত নর-নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি।'

তার কারণ এই যে গঙ্গা বয়ে চলেছে নারদের কীর্তন শুনে পুলকিত হয়ে। গঙ্গার প্রবাহ যেন শ্রীমাধবের বিগলিত করুণা। গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু উছলে ওঠা ধারা! গঙ্গার উৎপত্তি যেন শিবের জটাজাল থেকে ঝরে পড়া!

রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পে রয়েছে 'ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি।' গল্পের মধ্যে গ্রামবাঙ্গলার যে চেনা ছবি ফুটে উঠেছে তা এইরকম। গঙ্গার তীরে আমবাগানের নীচে কচুবন, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল পৌঁছেছে। নদীর বাঁকের কাছে পুরাতন ইটের পাঁজা জলের মধ্যে রয়েছে জেগে। জেলেদের নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা, সকালে জোয়ারের জলে ভেসে টলমল করছে। সকালে ভরা গঙ্গার উপরে শরতের রোদ, কাঁচা সোনার মতো, চাঁপা ফুলের মতো। চড়ার উপরে কাশবনে রোদ পড়েছে। রাম রাম বলে মাঝিরা নৌকা খুলে দেয়। পাখিরা নীল আকাশে আলোর মধ্যে আনন্দে পাখা মেলে উড়ে। ছোটো ছোটো নৌকাগুলো ছোটো ছোটো পাল ফুলিয়ে সূর্যকিরণে বের হয়। গঙ্গার জলরাশির উপর নৌকাগুলোকে পাখি বলে মনে হয়। তারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসে, আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়ানো। বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা প্রতিদিন ভরে উঠে।

এই গঙ্গায় সন্ন্যাসী প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে শুকতারাকে সামনে রেখে গঙ্গার জলে নিমগ্ন হয়ে ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করেন। প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়ে। অন্ধকার দূর হয়ে যেন কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফেটে গিয়ে ঊষাকুসুমের লাল আভা বের হয়ে আসে। মনে হয় মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে চেয়ে মহামন্ত্র পাঠ করেন, তারই উচ্চারিত শব্দ রাতের কুহক ভেঙে দেয়।

চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠতে থাকে। দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়ে যায়। স্নান করে যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার মতো পুণ্যদেহ নিয়ে জল থেকে ওঠেন, তাঁর জটাজুট থেকে জল ঝরে পড়ে, তখন নব সূর্যকিরণ তাঁর সর্বাঙ্গে পড়ে প্রতিফলিত হয়।

'গঙ্গা' নামে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ বসু (১৯৫৭)। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের মাছমারাদের গঙ্গা ও সন্নিহিত নদীগুলিতে লৌকিক জলযানে প্রবাহিত হয় জীবনসংগ্রামের কাহিনি। তারা বিশ্বাস করেন, যা দেবেন তা মা গঙ্গা। যদি দেন গঙ্গাই দেবেন হাত ভরে। না দিলে মরণ। আষাঢ় মাসে যেমন করে হোক গঙ্গায় আসতেই হবে। প্রতি বছরই আশা থাকে, সে বছর হয়তো মহাজনের ঋণ শোধ হবে। হয় না। যদি গঙ্গার দয়া হয়, তবে কয়েক মাস চলে। ■

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত আয়োজিত নববর্ষ আবাহন উৎসব এবং সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান

গত ৭ এপ্রিল আলিপুরে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবনে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তর উদ্যোগে আয়োজিত হলো **নববর্ষ ১৪৩১ আবাহন উৎসব** এবং **১৪৩১ বঙ্গাব্দের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান**। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং

চেয়ারম্যান রাধারমণ চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ভারতীয় জাতীয় গন্থাগার, কলকাতার অধিকর্তা ড. অজয়প্রতাপ সিংহ, প্রত্নতাত্ত্বিক ড. শুভ মজুমদার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অছি কুশল চৌধুরী, স্বস্তিকা পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক জয়ন্ত পাল, সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় এবং সংস্কৃতি ন্যাসের অছি সুভাষ ভট্টাচার্য।

কাবেরী পুইতণ্ডী করের পরিচালনায় গৌড়ীয়নৃত্য এবং সংস্থার ভাব সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। তারপর সমবেতভাবে নববর্ষের গান পরিবেশন করেন তনুশ্রী মল্লিকের পরিচালনায় সংস্থার সংগীতগোষ্ঠী। এই পর্বের শেষ অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য **বাল্মীকি প্রতিভা**-র নির্বাচিত অংশ। পরিবেশন করেন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষের পরিচালনায় সংস্থার শিল্পীরা। এই পর্বের প্রতিটি অনুষ্ঠানই দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

দ্বিতীয় পর্বে ড. ঘোষ এবং ড. চক্রবর্তী-সহ উপস্থিত অতিথিরা ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অতিথিদের সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওড়িশি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষকে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এবছরের **নটরাজ সম্মান**-এ সম্মানিত করা হয়। সম্মান স্মারক শিল্পীর হাতে তুলে দেন ড. রাধারমণ চক্রবর্তী ও ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ।

এরপর হয় বঙ্গভূমির রামায়ণ গাথা নিয়ে প্রকাশিত সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী ১৪৩১ বঙ্গাব্দের লোকার্পণ। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ এবং পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহায়তায় প্রকাশিত দেওয়ালপঞ্জীর সীমিত পরিসরে বঙ্গভূমির মন্দিরগাত্রের রামায়ণ গাথাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাজে যাঁরা চিত্র ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে বাংলাভাষায় রামায়ণ। সেই গানগুলির সংকলনে প্রকাশিত হয় **আমাদের রামায়ণ** শীর্ষক ছোটো পুস্তিকা। সংস্থার পক্ষ থেকে রামগানের গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠদানকারী শিল্পীদেরও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ছিল আলোচনা সভা। বিষয় ছিল **বঙ্গে রামায়ণের ইতিহাস ও বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্ক**। উপস্থিত অতিথিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন। আলোচনা চলাকালীন পরিবেশিত হয় সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের কণ্ঠে সদ্য রচিত কয়েকটি রামগান। সেই সঙ্গে মঞ্চের একপার্শ্বে অযোধ্যায় বিরাজিত রামলালার মুখাবয়ব চিত্রিত করেন শিল্পী শীর্ষ আচার্য। শিল্পকর্মটি তুলে দেওয়া হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের চেয়ারম্যান ড. রাধারমণ চক্রবর্তীর হাতে। অনুষ্ঠানস্থল ভাষা ভবনের পরিসর সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন সংস্থার অঙ্কনশিল্পী জয়দেব বণিক ও সহশিল্পীরা। অনুষ্ঠান মঞ্চকে নববর্ষের আঙ্গিকে সুন্দর ও অভিনবভাবে সজ্জিত করেছিলেন মেহেন্দী চক্রবর্তী ও সহ শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন সংস্থার দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত। জাতীয় সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

মাদপুরে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ৭ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুরে রূপা সরস্বতী শিশু মন্দিরে স্বস্তিকা পত্রিকার একটি পাঠক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং পত্রিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। সম্মেলনে প্রস্তাবনা করেন স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ কার্যকারিণীর সদস্য নিত্যানন্দ দত্ত। স্বস্তিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে পথনির্দেশ করেন জয়রাম মণ্ডল। এরপর উপস্থিত পাঠকদের একাংশ তাঁদের অনুভব এবং পত্রিকার বিষয়ে কিছু পরামর্শ রাখেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। পাঠক সম্মেলন পরিচালনা করেন জয়দেব দাস। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রণবেশ কর।

ত্রিপুরায় চা-বাগানে আলোচনা সভা

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের চা-বাগান শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে ত্রিপুরা রাজ্য প্ল্যান্টেশন কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি অনুসারে গত ১০ ও ১১ এপ্রিল

রাজ্যের বিভিন্ন চা-বাগানে শ্রমিকদের নিয়ে লোকজাগরণের উদ্যোগে কমলাসাগরে হরিশনগর চা-বাগান, বিশালগড় বাসস্ট্যান্ড ও অটোস্ট্যান্ডে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ত্রিপুরা রাজ্য সভানেত্রী শ্রীমতী দেবশ্রী কলই, সহ সভাপতি অজিত গোস্বামী, রাজ্য প্ল্যান্টেশন মহাসঙ্ঘ সম্পাদক শ্যামলেন্দু পাল এবং রাজ্য প্ল্যান্টেশন কমিটির সদস্য বিক্রম গোয়ালা। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সম্পাদক সজল দেবনাথ, বলাই দেবনাথ, সজল দেব-সহ রাজ্য কমিটির অনেকে।

প্রকৃতিপাঠের অনাবিল আনন্দে মহানন্দার চরে বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা

প্রতি বছরের মতো এবারও মালদহ জেলার বাচামারী বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের উদ্যোগে গত ১২ এপ্রিল স্থানীয় মহানন্দা নদীর চরে খোলা আকাশের নীচে অনাবিল প্রকৃতিপাঠের কালাংশে উপস্থিত ছিল শিশু মন্দিরের প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ১৭৯ জন শিক্ষার্থী। এক অভিনবত্বের ছোঁয়ায় শিশু মন্দিরের প্রাধান আচার্য পঙ্কজ কুমার

সরকার ভাই-বোনেদের সামনে মহানন্দা নদী উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে এক-একটি জেলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে; নদীর উপকারিতা, নদী আমাদের মা-- এসকল বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করে শিশুদের কোমল মনে গেঁথে দেন। শিশু মন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের সহযোগিতায় শিশুরা নদীতে স্নান, খেলা, সাঁতার কাটা, কলার ভেলায় চড়া ইত্যাদি সাবলীলভাবে করে। শিশুমন্দিরের শিশুরা এক অনাবিল আনন্দের জন্য এই দিনটির অপেক্ষা করে থাকে।

রিষড়া প্রেম মন্দিরে অন্নপূর্ণা পূজা

রিষড়া প্রেম মন্দিরের ৯০ বর্ষ পূতি ও শ্রীশ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ৪৪তম মহানির্বাণ তিথি পালন করা হলো। ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল তিনদিন ব্যাপী মহা ধুমধামে মা অন্নপূর্ণার পূজা ও কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গঙ্গাতীরে মনোরম পরিবেশে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

হিন্দুর জীবনবেদ গঙ্গা—সর্বপাপহারিণী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ভগবতী গঙ্গে!

বয়ে চলেছে গঙ্গা। সেদিকে তাকিয়ে ভাবতন্ময় শঙ্করাচার্য। তাঁর মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে উদ্গীত হচ্ছে স্তোত্র— 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণি তরলতরঙ্গে'। সব নির্জনতা ছিন্ন করে সে স্তোত্র প্রতিধ্বনিত দিক্‌দিগন্তে।

শঙ্করাচার্যের এই স্তোত্রে গঙ্গা কেবল একটি নদী নয়, গঙ্গা সুরেশ্বরী— দেবীদেরও দেবী। তিনি ভগবতী। ত্রিভুবনতারিণী— মোক্ষদায়িনী— সর্ব পাপ বিনাশিনী।

তবুও প্রশ্ন ওঠে,— কার উদ্ভব আগে? নদী গঙ্গা নাকি দেবী গঙ্গার? প্রশ্নটা সহজ, উত্তর কিন্তু জটিল। নদী গঙ্গার প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে ৭৫তম সূক্তে। জাহ্নবী নামে গঙ্গার কথা বলা হয়েছে ঋগ্বেদেরই তৃতীয় মণ্ডলের ৫৮তম সূক্ত ও প্রথম মণ্ডলের ১১৬তম সূক্তে। গঙ্গার সন্ধান পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও। অন্যদিকে দেবী গঙ্গার কথা রয়েছে পুরাণগুলিতে। তা থেকেই অবশ্য আসা যায় না কোনও সহজ সিদ্ধান্তে। শুধু বলা যায়, ভারতের জীবনে নদী ও দেবী গঙ্গা মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে।

পুরাণ বেদ-পরবর্তী যুগের রচনা। পুরাণ কাহিনি থেকে মনে হয় সুরলোকবাসিনী দেবী অথবা জলধারাই এক সময় নেমে আসে মরলোকে— প্রবাহিত হতে থাকে নদীরূপে।

গঙ্গার এই মর্ত্যে অবতরণ, কোনো সময় দৈবী প্রয়োজনে কখনও-বা মানবকল্যাণে অভিশপ্ত হয়ে। গঙ্গার অভিশপ্ত হওয়াটা অনেকটাই তার ভয়ানক চপল মানসিকতার কারণে। একই সঙ্গে গঙ্গা সাধারণ মানবীর মতোই সপত্নীদ্বেষী, কলহপরায়ণা। তারই কারণে বিড়ম্বিত গঙ্গার জীবন। তবে মর্ত্যে গঙ্গা সবসময়ই জীবনদায়িনী— পুণ্যসলিলা— মুক্তিদায়িনী।

নদী গঙ্গা

দেবী গঙ্গার আগে বরং একবার নদী গঙ্গার কথা বলা যাক সংক্ষেপে। ভারতের জাতীয় নদী গঙ্গা বয়ে গেছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো নদী প্রণালীর একটি। গঙ্গা অববাহিকা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নদী অববাহিকা।

মূল গঙ্গানদীর উৎস ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। তবে উৎপত্তিস্থলে এর নাম ভাগীরথী। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ভাগীরথীর সঙ্গমের মিলনের পর থেকে এর নাম হয়েছে গঙ্গা। গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৭০৪ কিলোমিটার। অবশ্য গঙ্গার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু ভিন্ন তথ্যও পাওয়া যায়।

দেবপ্রয়াগ থেকে প্রবাহিত গঙ্গা প্রথমে পশ্চিম ও পরে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নাগটিক্কা ও শিবালিক পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে হরিদ্বারে সমভূমিতে অবতরণ করে। সেখান থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার আহিরণের কাছে গঙ্গা দু'ভাগে ভাগ হয়ে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলি শহর পর্যন্ত গঙ্গার নাম ভাগীরথী এবং এর পরের অংশের নাম হুগলি। হুগলি নদীই বঙ্গোপসাগরে এসে মিসেছে। এই সঙ্গমস্থলই গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগরেই মকর সংক্রান্তিতে বসে গঙ্গাসাগর মেলা। গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তিতে সারা ভারত থেকে নামে পুণ্যার্থীর ঢল। সাধারণভাবে একে বাংলার কুম্ভ মেলা বলেও অভিহিত করা হয়।

পুণ্যতোয়া গঙ্গা নানা কারণে ক্রমাগত বিষাক্ত হয়ে ওঠায় ১৯৮৬-তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান চালু করেন। বহু হাজার কোটি টাকার প্রকল্পটি কার্যত ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বর্তমানে 'নমামিগঙ্গে' নামে এক প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও কিছু সুফল পাওয়া শুরু হয়েছে।

গঙ্গার উদ্ভব কাহিনি

নারদ একজন ভ্রমণশীল ঋষি, বীণা বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে ঘুরে বেড়ান তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র। পরম বিষ্ণুভক্ত তিনি। কিন্তু মনে রয়েছে একটা অহংকার। তাঁর মতো সংগীতজ্ঞ আর কেউ নেই। ওই একটা জায়গায় তিনি ভারী আত্মম্ভরী। অহংকারই হয় পতনের কারণ। তাই নারদের অহংকার চূর্ণ করতে শুরু হলো এক নাটকের অবতারণা।

সেদিনও নারদ বেরিয়েছিলেন পথে। দেখেন পথের ধারে পড়ে রয়েছেন কিছু বিকলাঙ্গ নর-নারী। থমকে দাঁড়ান নারদ। জিজ্ঞেস করেন, কে তাঁরা? কী তাঁদের পরিচয়? এমন অবস্থাই-বা তাঁদের হলো কেন?

—আমরা হলাম রাগ-রাগিনী। আপনার ভুল সুর-তালে গান গাওয়ার জন্যই আমাদের এই অবস্থা।

উত্তর শুনে নারদ ব্যথিত। বিব্রত। কিছুটা বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তা কী করলে সুস্থ হবেন তাঁরা?

—মহাদেব যদি গান শোনান তাহলেই আবার সুস্থ হবো আমরা। বলে রাগ-রাগিনীর দল।

নারদ একথা শুনে যান মহাদেবের কাছে। অনুরোধ করেন গান গাইবার জন্য।

মহাদেব জানান, যদি উপযুক্ত শ্রোতা পাওয়া যায় তাহলেই তিনি গান গাইবেন।

কিছুটা তাঁর নির্দেশ মতোই নারদ যান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে। রাজি করান তাঁদের শ্রোতা হতে। মহাদেবও এবার শুরু করেন গান। তাঁর সে গানের কিছুই বুঝতে পারেন না ব্রহ্মা। বিষ্ণু বোঝেন কিছুটা। তাতেই তিনি দ্রবীভূত হন। গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি তাঁর কমণ্ডলুতে ভরে নেন সেই জল। সে জলই পবিত্র গঙ্গা। আর ওটা ব্রহ্মার সেই কমণ্ডলু। একদিন যেটা নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সে নারীই গঙ্গা। আজ আবার দ্রবীভূত বিষ্ণু বা গঙ্গাজলে পূর্ণ হলো ব্রহ্মার কমণ্ডলু। আর এটিই হলো গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি কাহিনি।

আরও কথা

দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অবশ্য রয়েছে গঙ্গার উদ্ভবের আরেক কাহিনি। এখানেও রয়েছে মহাদেবের গান গাওয়ার কথা। রাস পূর্ণিমায় সংগীতমুখর হন মহাদেব। সে গান শুনে রাধাকৃষ্ণ দুজনেই গলে জল হন। আর তার থেকেই উৎপত্তি গঙ্গার।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার অন্য আরেক কাহিনি। এক সময় কৃষ্ণের প্রেমে পড়েন গঙ্গা। তাঁর ওই অনুরাগ দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠেন রাধা। রাগে গঙ্গাকে খেয়ে ফেলতে যান রাধা। ভয়ে গঙ্গা আশ্রয় নেন কৃষ্ণের চরণে। ফলে জলশূন্য হয় পৃথিবী। জলের জন্য হাহাকার ওঠে চারিদিকে। সকলের দুর্দশায় কাতর হয়ে দেবতারা শরণ নেন শ্রীকৃষ্ণের। তাঁদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আঙুলের নখ থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার কথায় গঙ্গাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভাগবতে গঙ্গার বিষ্ণুপদী হওয়া নিয়ে রয়েছে ভিন্ন এক কাহিনি। একবার ত্রিবিক্রম রূপী বিষ্ণুর বাঁ পায়ের আঙুলের নখে ছিন্ন হয় ব্রহ্মাণ্ড কটাহ। তাতেই এসে জমা হয় সব জল। এই জল বহুদিন আটকে ছিল আকাশে অর্থাৎ বিষ্ণুপদে। আর তার থেকেই ওই জল বা গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী।

বিষ্ণুপদী গঙ্গা যেখানে আটক ছিল সেই বিশেষ জায়গার নাম ধ্রুবমণ্ডল। এই ধ্রুবমণ্ডলে তপস্যা করেন ধ্রুব। বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা আসেন চন্দ্রলোকে। সেখান থেকে সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মলোকে নেমে গঙ্গা প্রবাহিত হন চারটি ধারায়। সেই চার ধারার নাম সীতা, চক্ষুষ, অলকানন্দা ও ভদ্রা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথায়, বিষ্ণুপদ থেকে চন্দ্রে এবং চন্দ্রকিরণের সঙ্গে মিশে মেরুপৃষ্ঠে এবং সেখান থেকে হিমালয়ে শিবের মাথায় অবতীর্ণ হন গঙ্গা।

হিমালয় দুহিতা

দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করলেন শিবজায়া সতী। শোকে-ক্রোধে শুরু মহেশ্বরের তাণ্ডবনৃত্য। তারপর একসময় শান্ত হন শিব। ব্রহ্মাণ্ড আবার সুস্থির। এ হলো সেই সময়ের কথা।

দেবতাত্মা হিমালয়। মহামেরু বা মেরুর অতি সুন্দরী কন্যা মেনা বা মেনকা তাঁর স্ত্রী। তাঁদেরই কন্যা হিসেবে জন্ম নেন গঙ্গা এবং উমা বা পার্বতী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কথা। সতীই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হিমালয়-মেনকার দুই কন্যা রূপে জন্ম নেন। স্কন্দ পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে, গঙ্গা, গৌরী ও উমা এক ও অভিন্ন।

হিমালয় ও মেনকার প্রথম সন্তান গঙ্গা। তাঁর জন্মের পরই দেবকার্যের জন্য গঙ্গাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চান দেবতারা। হিমালয়কে তাঁরা বলেন, 'দেবকার্যচিকীর্ষয়া' গঙ্গাকে আমাদের দান করুন। ধর্মাত্মা হিমালয়, অন্য নাম যাঁর হিমবান, দেবতাদের কথায় 'দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবত্রীম্। স্বচ্ছন্দপথগাৎ গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া (রামায়ণ ১/৩৫/১৭)— গঙ্গাকে তুলে দেন দেবতাদের হাতে জগৎ কল্যাণে।

দেবতারা ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য গঙ্গাকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ত্রিপথগা গঙ্গা স্বর্গে সুরনদী মন্দাকিনী বা আকাশগঙ্গা, পাতালে ভোগবতী এবং মর্ত্যে গঙ্গা রূপে লোককল্যাণে প্রবাহিত হতে থাকে। মর্ত্যে গঙ্গা হয় সর্বপাপহারিণী। কলিযুগে গঙ্গাই হয় 'সর্বতীর্থোত্তমা'।

গঙ্গার এই মহিমার কথা বলেন, স্বয়ং পার্বতী। একবার পার্বতীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া তীর্থ দর্শন ও পুণ্যস্নানের বাসনার কথা জানান দেবীকে। পার্বতী সেই সময় জয়া ও বিজয়াকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে শিবলোকে ফিরিয়ে আনেন। জয়া ও বিজয়া সমস্ত তীর্থ দর্শন হলো না বলে আক্ষেপ করলে দেবী বলেন, গঙ্গা হলো সর্বতীর্থজননী। গঙ্গাই সর্বধর্ম প্রসবিনী। গঙ্গা দর্শন ও গঙ্গাস্নানেই সমস্ত তীর্থদর্শন ও পুণ্যস্নানের ফল। তাই দুঃখ করো না। সবতীর্থ দেখারই ফল লাভ করেছো তোমরা।

কার্তিক-গণেশের মা গঙ্গা

গঙ্গা দেবমাতা। পার্বতীর বড়ো বোন তিনি। পার্বতীর দুই ছেলে গণেশ ও কার্তিক।

দুয়ের জন্মের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন গঙ্গা। তাই-বা কেন, পার্বতীর মতোই তিনিও কার্তিক-গণেশের জননী। রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে এ সম্পর্কিত নানা কাহিনি।

শিব পুরাণ এবং আরও কয়েকটি পুরাণ মতে, একদিন পার্বতী শরীরের ময়লা তুলে তা দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করেন। পুতুলের রূপে পার্বতী মোহিত। কিন্তু পুতুল তো প্রাণহীন। তাই পার্বতী সেই পুতুলকে গঙ্গায় ডুবিয়ে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পুত্ররূপে বরণ করেন তাঁকে। এই পুতুল-পুত্রই হলেন গণেশ। পুরাণ মতে, কেবল পার্বতী নন, গঙ্গাও গণেশের মা। দু'জন মা হওয়ার কারণেই গণেশের একটি নাম দ্বৈমাতুর বা গাঙ্গেয়।

গণেশের মতো কার্তিকের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন গঙ্গা। কার্তিক পার্বতীপুত্র হলেও গণেশের মতোই গঙ্গাও তাঁর আর একজন মা। তিনি হলেন কার্তিকের ধাত্রীমাতা বা ধাইমা। পুরাণ কথায়, শিব-পার্বতীর বিহারের সময় শিবের স্খলিত তেজ ধারণ করেন প্রথমে অগ্নি। কিন্তু সে তেজ বেশিক্ষণ ধারণ করতে না পেরে তা গঙ্গাকে দেন। কিন্তু গঙ্গাও তা ধারণে অক্ষম হয়ে শরবনে তা নিক্ষেপ করেন। শরবনে নিক্ষিপ্ত সেই তেজ থেকেই উদ্ভব হয় কার্তিকের। নবজাতককে কৃত্তিকারা পালন করার জন্যই তাঁর নাম হয় কার্তিক।

কার্তিকের জন্মের পর অগ্নি ও গঙ্গা দুজনেই দাবি করেন, কার্তিক তাঁরই ছেলে। বিরোধ মেটাতে বিষ্ণু তাদের নিয়ে যান শিবের কাছে। শিব পার্বতীকে নিয়ে শরবনে এসে শিশুকে দেখে বলেন, দেখা যাক শিশু কার দিকে তাকায়। শিবের অভিপ্রায় বুঝে শিশু নিজেকে কুমার, বিশাখ, পাখি ও নৈগমেয়— এই চার অংশে ভাগ হয়ে শিব, পার্বতী, গঙ্গা ও অগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর থেকেই গঙ্গাও কার্তিকের এক মায়ের স্বীকৃত পান।

গঙ্গা-শান্তনু-ভীষ্ম

গঙ্গার মর্ত্যে আসার আর একটা কাহিনি রয়েছে মহাভারতে। এখানে গঙ্গা একই সঙ্গে দেবী ও নদী। এই ঘটনাটি যদি না ঘটত তাহলে হয়তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাই হতো না। কুরুবংশের ইতিহাসও লেখা হতো অন্যভাবে।

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মহাভিষ ছিলেন মহাবীর, মহাধার্মিক। দেবলোকে নিত্য তাঁর যাতায়াত। একদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাভিষ। ছিলেন অন্যান্য দেবতারাও। এমন সময় ব্রহ্মাকে প্রণাম জানাতে এলেন গঙ্গা। সে সময় হঠাৎ-ই জোরে বয়ে যায় বাতাস। সে হাওয়ায় গঙ্গা প্রায় বিবসনা। সভায় দেবতারা সকলে নত মস্তক। কিন্তু মহাভিষ পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন গঙ্গার দিকে। গঙ্গাও দেখতে থাকেন মহাভিষকে। কামার্ত দুজনেই মিলতে চান দুজনের সঙ্গে।

তাঁদের এই অসংযত মনোভাবে ক্ষুব্ধ হন ব্রহ্মা। ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন দুজনকেই। বলেন ব্রহ্মলোকে বাসের অধিকার হারিয়েছ তোমরা। যাও, জন্ম নাও গিয়ে নরলোকে। সেখানে তোমরা হবে স্বামী-স্ত্রী।

ব্রহ্মার সেই অভিশাপে মহাভিষ বা গঙ্গা কেউই সেভাবে বিচলিত হন না। গঙ্গা কেবল বলেন, এই অভিশাপের কাল কি কখনও কাটবে না?

ব্রহ্মা তখন শান্ত। ক্রোধ অন্তর্হিত। তাই শান্ত কণ্ঠেই বলেন, অষ্টবসুর মাতা হবে তুমি। তাদের জন্মের পর হবে তোমার মুক্তি। শোনো বশিষ্ঠের শাপে বসুদেবকেই নিতে হবে মানব জন্ম। তাদেরই মা হবে তুমি।

এরপর কুরুবংশে শান্তনু হয়ে জন্মান মহাভিষ। গঙ্গার সঙ্গে হয় তাঁর মিলন। বিয়ের সময় তাঁর শর্ত ছিল তাঁর কাজে কোনোরকম বাধা দেওয়া যাবে না। বাধা দিলেই বিচ্ছেদ। রাজাকে ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। শর্ত মেনে নেন রাজা শান্তনু।

দিন যায়। গঙ্গার সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জলে ডুবিয়ে দেন। শর্তের কথা মনে করে বাধা দেন না শান্তনু। কিন্তু অষ্টম বারে বাধা দিলে গঙ্গা ওই সন্তানকে নিয়ে চলে যান। এই সন্তানেরই নাম দেবব্রত। তিনিই ভীষ্ম। ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করলে গঙ্গাকে কাঁদতে দেখা যায়। ভীষ্মের জন্মের পরই শাপমুক্ত গঙ্গা ফিরে যান স্বর্গে। মানব কল্যাণে তাঁরই একটি ধারা নদী হিসেবে প্রবাহিত।

স্বর্গ থেকে বিদায়

গঙ্গা দেবী। সুরলোকে তাঁর বাস। কিন্তু কিছুটা নিজের দোষেই তিনি তিনি হন স্বর্গচ্যুত। প্রবাহিত হতে হয় তাঁকে এই মরলোকে। অবশ্য, এটাই ছিল অনিবার্য। দেবতাদের হিত এবং মানুষের কল্যাণের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে প্রবাহিত হতে হবে এটা ছিল পূর্ব নির্দিষ্ট। বিধির সেই বিধানেই গঙ্গার এই পৃথিবীতে অবস্থান।

পুরাণ কাহিনি। বিষ্ণুর তিন স্ত্রী— লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। তিন সতীনে নেই এতটুকু বনিবনা। ঝগড়া এমনকী মারামারিও লেগে থাকত তাঁদের মধ্যে। ঝগড়াটা বেশি হতো সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে। লক্ষ্মী সে ঝগড়া থামাতে গেলে, দুজনেই লেগে যেত লক্ষ্মীর পেছনে।

সেদিনও সরস্বতী-গঙ্গার প্রথমে কথা কাটাকাটি, অবস্থা সামাল দিতে এগিয়ে আসেন লক্ষ্মী। বাধা পেয়ে সরস্বতী অভিশাপ দেন লক্ষ্মীকে, যা তুই পৃথিবীতে। তুলসীগাছ হবি সেখানে। লক্ষ্মীকে অকারণে শাপ দেওয়ায় ক্ষিপ্ত গঙ্গা এবার সরস্বতীকে বলেন, তুই তাহলে মর্ত্যে নদী হয়ে থাক। পালটা সরস্বতী বলেন, কী বললি আমি নদী হবো? তাহলে তুইও তাই হ' পৃথিবীতে।

পারস্পরিক অভিশাপের ফলে তিনজনই হলেন মর্ত্যবাসিনী। এবং অবশ্যই সেটা জনকল্যাণের জন্যই। অন্য কথায় বলা যায়, পুরো ব্যাপারটাই ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। এর সে কারণেই লক্ষ্মী-সরস্বতী-গঙ্গার এই কলহের চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল আগের থেকেই।

গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। ঋষি কপিলের ক্রোধে সগররাজার ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করা ছাড়াও শুষ্ক বালিতে ভরা সাগরকে জলপূর্ণ করার জন্যও প্রয়োজন ছিল গঙ্গাবতরণের। বস্তুত মানুষকে কলুষমুক্ত করে তাদের মুক্তির পথ করে দেওয়ার একটি মাত্র উপায়ই ছিল এটি। মানবকল্যাণের জন্যই গঙ্গা একরকম স্বেচ্ছাতেই হন মর্ত্যবাসিনী।

অতি অহংকারের কারণেই মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল সগররাজার ষাট হাজার সন্তানের। ইন্দ্রের ছলনায় বিভ্রান্ত সগর-সন্তানরা মহাঋষি কপিলের আশ্রমে যজ্ঞের ঘোড়াকে দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মান হরণ করেন তাঁর। ধ্যানভঙ্গে কপিলের কোপদৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয় সগর সন্তানরা। পরে কৃপাপরবশ হয়ে কপিল জানান, একমাত্র গঙ্গাজলের স্পর্শেই

মুক্তি পাবে অহংকারী সগর সন্তানরা।

সেই কথা অনুযায়ী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার জন্য তপস্যা শুরু করেন রাজা সগরের নাতি অংশুমান। কিন্তু তিনি বা তাঁর পুত্র তপস্যা করেও গঙ্গাকে আনতে পারেননি। অবশেষে দিলীপের ছেলে ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা এই পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং সেই গঙ্গাজলের স্পর্শে মুক্তি পান ভস্মীভূত সগর সন্তানরা। তাই নয়, সাগরে গঙ্গার সঙ্গমস্থল পরিণত হয় মহাতীর্থে। গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত সেই স্থানে এখনও মকরস্নান উপলক্ষ্যে নামে মানুষের ঢল— সারা— ভারত থেকে।

অন্য একটি কারণেও গঙ্গার মর্ত্যে আসাটা ছিল অত্যন্ত জরুরি। পুরাণ কাহিনি অনুসারে, বৃত্রাসুর নিহত হওয়ার পর কালকেয় অসুররা সাগরের নীচে লুকিয়ে থাকে। রাতে ওপরে উঠে তারা মুনি, ঋষি-সহ সমস্ত মানুষের চরম ক্ষতি করতে থাকে। ঋষিরা অগস্ত্যর শরণ নিলে তিনি এক গণ্ডুষে সমুদ্রের সব জল পান করেন। অনায়াসেই শুকনো সাগরে কালকেয়দের বধ করেন দেবতারা। নেমে আসে শান্তি।

এবার সাগরকে আগের অবস্থায় আনা দরকার। অগস্ত্য কিন্তু বলেন সব জল তিনি হজম করে ফেলেছেন। তাই সাগর ভরাতে তিনি অক্ষম। এখন গঙ্গাই শুধু ভরাতে পারবে সাগর। হয়ও তাই। সগর সন্তানদের উদ্ধারের জন্য মর্ত্যে নেমে আসেন গঙ্গা। সাগরে মিশে আবার তাকে ফিরিয়ে দেন তার আগের রূপ।

পাপ হরা

সদ্য পাতক সংহন্ত্রী--- সদ্য সদ্য পাপহরণকারিণী গঙ্গা। কিন্তু গঙ্গা স্নানমাত্রই কি সকলে পাপমুক্ত হয়? অথবা স্নানের পর ব্যক্তি কি নিজেকে কলুষমুক্ত ভাবে? ব্যাপারটা জানার জন্য কৌতূহলী হন পার্বতী। জিজ্ঞাসা করেন মহেশ্বরকে প্রকৃত বিষয়টা জানতে।

মহাদেব সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, পার্বতী, তুমি চলো আমার সঙ্গে। নিজের চোখে সব দেখে তুমি পেয়ে যাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

দুজনে গঙ্গাতীরে এলেন। আগের কথা মতো, শিব শব হয়ে পড়ে রইলেন পাড়ে। পার্বতী স্বামীকে হারিয়ে বিলাপ করতে থাকেন। দলে দলে মানুষ গঙ্গাস্নান করে ওই পথে ফিরছিল। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাঁরা। পার্বতী বলেন, সাহায্য তো চাই। তবে শর্ত একটাই। কেবল নিষ্পাপ ও পবিত্ররাই সাহায্য করবেন।

একথায় মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকে সকলে। গঙ্গাস্নান করলেও মনে তাদের ছিল না স্থির বিশ্বাস। তাই কেউ-ই নিজেকে নিষ্পাপ মনে করতে পারেনি। সকলেই মাথা নীচু করে চলে যায়। এমন সময় সেখানে আসে এক ঘোর পাপী। পার্বতীর বিলাপে তার হৃদয় গলে যায়। সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে সে। পার্বতী জানান তাঁকে শর্তের কথা।

পাপী ভাবে, আমার যত পাপই থাক, গঙ্গাস্নান করলেই তো সব পাপ ধুয়ে যায়। তাই সে পার্বতীকে বলে, একটু অপেক্ষা করুন। গঙ্গাস্নান করে এসে সাহায্য করব আপনাকে। এই বলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ফিরে আসে লোকটি। ততক্ষণে অন্তর্হিত হয়েছেন শিব-পার্বতী।

লোকটিকে দেখিয়ে শিব বলেন, এর মধ্যে দৃঢ়তা আছে। বিশ্বাস আছে। তাই গঙ্গাস্নানে সব পাপমুক্ত। কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া গঙ্গাস্নান— কেবলই স্নান। তাতে পাপমুক্ত হওয়া যায় না। এটাই হলো ধর্মের সার কথা। সবসময় জানবে, বিশ্বাস ও দৃঢ়তাই সব। মন চাঙ্গা তো সব গঙ্গা।

গঙ্গার স্পর্শেই মুক্তি

গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা জানা যায় ধনাধিপতি নামে এক বণিকের জীবন কথা থেকেও। ধনপতি ছিল অত্যন্ত লোভী, নৃশংস। অর্থের লোভে যে কোনো ধরনের কাজ করত সে। নরহত্যা, স্ত্রী হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি যেন কিছুই বাদ ছিল না তার।

কালক্রমে একদিন বনপথে মৃত্যু হলো ধনাধিপতির। যমরাজ তাকে অসিপত্র নামে এক মহা নরকে নিক্ষেপ করেন। নিদারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে সে।

ওদিকে ধনাধিপতির মৃতদেহ নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে থাকে শিয়ালে-কুকুরে। আকাশ থেকে শকুনির দল মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিয়ালরা সরে যায় দূরে। তারই মধ্যে একটি শিয়াল ক্ষেপে গিয়ে ছুটতে শুরু করে। ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে ওঠে শিয়াল। প্রচণ্ড পিপাসায় শিয়ালটা সামনেই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, পেট পুরে পান করে জল। তারপরও ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। শিয়ালের পেটে তখন জীর্ণ হয়নি ধনাধিপতির দেহের সব মাংস। গঙ্গাজলের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনাধিপতির দেহ পরিণত হলো শিবদেহে। দিব্যরসে সেই দেহ যাত্রা করে শিবলোকের দিকে।

এই ঘটনায় পরম বিস্মিত যমের রক্ষীরা। কাঁপন ধরে তাদের। সেই অবস্থায় তারা সবকথা বলে যমরাজকে। যমও চমকিত। ধ্যানে বসলেন তিনি। জানতে পারলেন সব। তারপর সকলকে বললেন, এসবই হয়েছে গঙ্গার মাহাত্ম্যের কারণে, বণিকের মরদেহ খাওয়া শিয়ালটির পেটে ছিল সেই মাংস অজীর্ণ অবস্থায়। সেই মাংসে গঙ্গাজলের স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে দূর হয় বণিকের সব পাপ। সে পেয়েছে শিবলোকে যাওয়ার অধিকার। জেনো, এসবই হয়েছে গঙ্গার মাহাত্ম্যের কারণে।

দর্শনেই পাপ নাশ

গঙ্গা সর্ব পাপবিনাশিনী। গঙ্গার প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়, 'সদ্যপাতক সংহন্ত্রী, সর্বাসু সদ্য দুঃখ বিনাশিনী/সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি'— এই মন্ত্র যে কেবলই স্তুতি তা নয়, গঙ্গার মাহাত্ম্যর কথা জানা যায় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে।

একটি কাহিনি, পুরাকালে এক ছিল ব্যাধ, নাম তার সর্বান্তক। সারা জীবন কেটেছে তার নানা পাপকর্মে। বনে গিয়ে অকারণে পশুহত্যা করত। ভুলেও কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করেনি সে। ধর্মকর্মের কোনো জায়গা ছিল না তার জীবনে। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে তার ছিল না কোনো চিন্তা। আর সে কারণে কেবল যে প্রাণী হত্যা করত তা নয়, সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেই করত চুরি চামারি। সব মিলিয়ে সর্বান্তক তার নমের মতোই সকলের কাছেই ছিল আতঙ্ক। সকলে তাকে ভয় পায় দেখে সর্বান্তক একরকম আনন্দই পেত।

দিন যায়। তারি মধ্যে ঘটে একটা ঘটনা। সেদিন বনে অনেক পশু শিকার করে সর্বান্তক ধরেছিল ফেরার পথ। ওই একই সময় বনের আরেক অংশে মৃগয়ায় আসেন চিত্রসেন নামে এক মহারথী রাজা। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে

রাজা একটা হরিণকে দেখতে পেয়ে তির ছোঁড়েন। তিরবিদ্ধ হরিণ সে অবস্থায় ছুটতে ছুটতে সর্বান্তক যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেখানে ধপাস ক রে পড়ে মারা যায়। সর্বান্তক ভাবে, নিশ্চয় কেউ একে তিরবিদ্ধ করেছে। কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে লোভের বশে হরিণের মাংস কাটতে থাকে।

রাজা চিত্রসেন দূর থেকে সবকিছু দেখে দ্রুত সেখানে এসে ব্যাধের দড়ি দিয়েই তাকে বেঁধে সদলবলে গঙ্গা পার হয়ে রাজধানীতে ফেরেন। নৌকায় আসার সময় সর্বান্তক গঙ্গার মাহাত্ম্য না জেনেই গঙ্গাদর্শন করে। এই দর্শনের কী ফল হবে তা কিন্তু পাপী ব্যাধ জানত না। সে রাজদণ্ডের ভয়ে কিছুটা উদাসভাবেই গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল।

পরদিন রাজার বিচারে কারাদণ্ড হয় ব্যাধের। কারাগারে থাকার সময়ই হঠাৎ মৃত্যু হয় সর্বান্তকের। আর তারপরেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

পাপী ব্যাধের আত্মাকে নিয়ে যমদূতরা যমলোকে যাওয়ার পথে পেল বাধা। বাধা দিল শিবদূতরা। তারা বলে, দুষ্কর্ম করছো তোমরা। সব না জেনেই একে যমলোকে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা। এখুনি ছেড়ে দাও ওকে। শুরু হয় যমদূত আর শিবদূতদের তর্কাতর্কি। বাধা পেয়ে যমদূতরা যমলোকে ফিরে যমরাজকে সব জানায়।

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বলেন, দেখো তো— ওই ব্যাধ কোনো পুণ্যকর্ম করেছে কিনা? চিত্রগুপ্ত তন্নতন্ন খুঁজেও খাতায় ব্যাধের কোনো পুণ্যকাজের সন্ধান পেলেন না।

যমরাজ তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য চিত্রগুপ্তকে বলেন, বেশ, খাতায় তুমি ব্যাধের পুণ্যকাজের কোনো সন্ধান পেলে না, কিন্তু এর জীবনের কথা একবার শোনাওতো।

রাজার আদেশে চিত্রগুপ্ত শোনাতে থাকেন ব্যাধের কার্যকলাপের কথা। যমরাজ মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন সেসব কথা। যেই শুনলেন, রাজার হাতে বন্দি ব্যাধ নৌকা থেকে গঙ্গা দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তিনি বলেন, জানো চিত্রগুপ্ত, আমি মহাদেবের কাছে শুনেছি, যে ভাবেই হোক, কারো গঙ্গাদর্শন হলেই তার সব পাপ দূর হয়। তার ওপর আমাদের আর কোনো অধিকার থাকে না। গঙ্গাদর্শনের ফলে পাপমুক্ত সর্বান্তকের ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। সুতরাং, তোমরা ভুল করেছো। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কারও না। জেনে রাখো, মরলোকে গঙ্গা স্নান, গঙ্গাদর্শনের মতো পুণ্য কাজ আর কিছুই নেই।

গঙ্গার পুনর্জন্ম

জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমীতে গঙ্গা অবতীর্ণ হন মর্ত্যে। তাই ওই দিনটিকে বলা হয় দশহরা। ওইদিন গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গার পূজা করলে দশরকম ও দশজন্মের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সে কারণেই দশহরা হিন্দুজীবনে স্মরণীয় পুণ্য তিথি। দশহরা যদি হয় মর্ত্যে গঙ্গার অবতরণের প্রথম দিন, তাহলে বৈশাখের শুক্লাসপ্তমী হলো গঙ্গার পুনর্জন্মের দিন। বলা যায়, দশহরারও আগেই ওই দিনটি আপন মাহাত্ম্যে যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৈশাখের ওই শুক্লা সপ্তমীকে বলা হয় গঙ্গাজয়ন্তীর দিন। গঙ্গা সপ্তমী হিসেবেই রয়েছে দিনটিই প্রসিদ্ধি।

পুরাণ কথা, গঙ্গা তরলা, চপলা। স্বর্গ থেকে মহাদেবের মাথায় পড়ার মুহূর্তে থেকেই বারে বারে দেখা গেছে গঙ্গার এই চাপল্য। সম্পর্কে শিব হচ্ছেন গঙ্গার ছোটো ভগ্নীপতি। তাই তরল রহস্যে 'সুবৃহৎ রূপং কৃত্বা' দুঃসহ বেগে শিবকে নামিয়ে নিতে যান গঙ্গা। গঙ্গার এই কুমতলব বুঝতে পেরে শিব বললেন জটার মধ্যে সংবজ্ঞারান্ গণান্ বহুন্' আটকে রাখেন। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব বিন্দু সরোবরে গঙ্গাকে মুক্ত করে দেন।

এতেও কিন্তু শিক্ষা হয় না গঙ্গার। প্রবাহের পথে ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষির আশ্রম ভাসিয়ে মজা পান তিনি। সেই মজার ছলেই জহ্নুমুনির আশ্রমও ভাসান গঙ্গা। ক্রুদ্ধ জহ্নু এক চুমুকেই উদরস্থ করেন গঙ্গাকে। ফলে বন্ধ হয় গঙ্গার প্রবাহ। ভগীরথ আবার বসেন তপস্যায়। তুষ্ট জহ্নু তখন তাঁর জানু চিরে (মতান্তরে কান দিয়ে) গঙ্গাকে মুক্ত করেন। ফলে পুনর্জন্ম হয় গঙ্গার। জহ্নুকন্যা হিসেবে নাম হয় জাহ্নবী।

নানা কারণেই গঙ্গার এই পুনর্জন্মের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি হিন্দুর কাছে এটি মহা পুণ্যের দিন। এইদিনের গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা মানবজীবনকে ধৌত করে পুণ্যপ্রবাহে।

দেবী মকর বাহনা

গঙ্গা 'সুখদা মোক্ষদা'। তিনি সুখদায়িনী, মোক্ষ প্রদায়িনী। তাঁর বাহন মকর। বিভিন্ন পুরাণ অনুযায়ী কখনও তিনি দ্বিভুজা কখনও-বা চতুর্ভুজা। তাঁর গায়ের রং-ও সব পুরাণ অনুযায়ী একরকম নয়।

পদ্মপুরাণের বর্ণনায় গঙ্গা শুভ্রবর্ণা দ্বিভুজা। স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী তিনি চতুর্ভুজা, গায়ের রং চন্দ্র সৌম্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গঙ্গা শ্বেতচম্পকবর্ণা। বৃহদ্ধর্মপুরাণেও তাঁকে বলা হয়েছে চতুর্ভুজা। অগ্নিপুরাণে তিনি শ্বেতবর্ণা।

গঙ্গার ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে গঙ্গা হলেন, 'সুরূপং চারুনেত্রাঞ্জ চন্দ্রীযুতগমপ্রভাম্।' অন্য এক ধ্যানমন্ত্রে আছে '...গদাং শুক্লবর্ণাং নানালংকার ভূষিতাম্।/ চতুর্ভুজাং প্রসন্নাস্যাং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনীম্।

এইসব মন্ত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সর্বত্রই গঙ্গাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, মুক্তি ও মোক্ষদায়িনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে কারণেই সকলের কাছেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা হলো প্রায় আবশ্যিক একটা কৃত্য।

গঙ্গায় নিত্যস্নান করে থাকেন অসংখ্য মানব। তবে বিশেষ বিশেষ যোগেও গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজার বিধান আছে। সেইসব যোগের অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গ্রহণে চূড়ামণি যোগের স্নানে সব পাপ বিনষ্ট হয় বলে বিশ্বাস। একই সঙ্গে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীতে বা গোবিন্দ দ্বাদশীতে স্নানও মহাপাপনাশিনী বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে গঙ্গাবতরণ উপলক্ষ্যে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমীতে দশহরায় গঙ্গাস্নান ও পূজা হিন্দুর প্রায় আবশ্যিক একটি কৃত্য। একইসঙ্গে বৈশাখে শুক্লা সপ্তমীতে গঙ্গাজয়ন্তী, চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্র যোগে বারুণী স্নান ভারতের প্রায় সর্বত্রই একটি মহৎ অনুষ্ঠান।

সবশেষের কথা : গঙ্গা কেবল একটি সাধারণ নদী নয়। গঙ্গা কেবল এক দেবীও নয়। গঙ্গা বস্তুত হিন্দুর জীবনবেদ। গঙ্গা হিন্দুর ঐহিক ও পরমার্থিক জীবনের পরমাশ্রয়। পরমাগতি ও পরমারাধ্যাও বটে। □

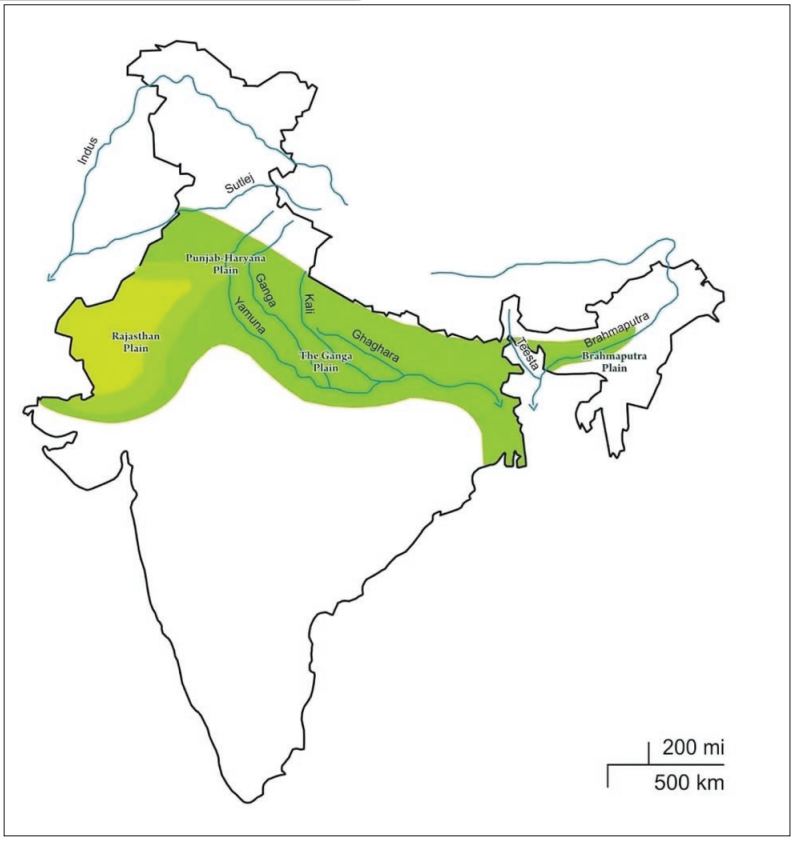

পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গা-বিধৌত সমভূমিরই উত্তরাধিকার

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের নানান উপনদী বাহিত পলি ও অন্যান্য নুড়িপাথরের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি। এরই অন্য নাম সিন্ধু-গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অথবা উত্তরভারতীয় বৃহৎ সমভূমি। এর চারটি বিভাগ : ১. রাজস্থানের সমভূমি, ২. পঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি, ৩. গাঙ্গেয় সমভূমি এবং ৪. ব্রহ্মপুত্রীয় সমভূমি। গাঙ্গেয় সমভূমি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত : ১. উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত।

ইন্দো গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটির উত্তর-দক্ষিণ সীমানা হচ্ছে যথাক্রমে হিমালয় পর্বতমালা এবং উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল। এই সমভূমির পূর্ব-পশ্চিম সীমানা হচ্ছে পূর্বের গাঙ্গেয় মুখ এবং পশ্চিমের সিন্ধু-মুখ। অর্থাৎ উত্তরে শিবালিক পর্বতমালা, পশ্চিমে মরুভূমি, দক্ষিণে মালভূমি এবং পূর্বে পূর্বাঞ্চল পর্বতমালা। এটি ৩২০০ কিলোমিটারের মতো প্রশস্ত। এই বৃহত্তর সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে যে রাজ্যগুলির অবস্থান তা হলো পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের কিয়দংশ।

গাঙ্গেয় সমভূমিতে গঙ্গাই মুখ্য নদী, তাই এর নাম এমনতরো। আরও যে নদীগুলি হিমালয় পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা হলো যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী ইত্যাদি। উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে চম্বল, বেতোয়া, কেন, শোন প্রভৃতি নদীগুলি গাঙ্গেয় নদীতন্ত্রে এসে মিশেছে। এদেরও গাঙ্গেয় পলিগঠিত সমভূমির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি

এটি গাঙ্গেয় সমভূমির উচ্চতর অংশ। শিবালিকের ৩০০ মিটার কনট্যুর রেখা এর উত্তর সীমা, উপদ্বীপীয় সীমানা এর দক্ষিণ সীমা, যমুনা নদী প্রবাহ অঞ্চল এর পশ্চিম সীমা। তবে পূর্ব সীমাটি অস্বচ্ছ। ১০০ মিটার কনট্যুর লাইনকে পূর্ব সীমা ধরা হয়।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি পূর্ব-পশ্চিমে ৫৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৮০ কিলোমিটার প্রশস্ত। আয়তন প্রায় ১.৪৯ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই সমভূমির গড় উচ্চতা ১০০ থেকে ৩০০ মিটার।

মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বদিকে এর অবস্থান। এটি উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ এবং বিহার রাজ্য নিয়ে গঠিত। পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ৬০০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণের বিস্তার ৩৩০ কিলোমিটার। মোট আয়তন ১.৪৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকটি যথাক্রমে হিমালয় ও মালভূমির সুনির্দিষ্ট সীমানায় ধরা। তবে পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি। নির্দিষ্ট কনট্যুর লাইনই তার সীমা নির্দেশ করে।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি

এই সমভূমির মধ্যে রয়েছে বিহারের পূর্ণিয়ার কিষাণগঞ্জ এবং সেই সঙ্গে পুরুলিয়া ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অংশ বাদে বাকি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ এই সমভূমি অঞ্চলে পড়েছে। উত্তরে দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার ৫৮০ কিলোমিটার। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিরাজিত এর আয়তন মোটামুটি ৮১ হাজার বর্গ কিলোমিটার। সমভূমিটি কোথাও খুবই অপ্রশস্ত, যেমন রাজমহল পাহাড় থেকে বাংলাদেশ বর্ডারের মধ্যে বিস্তার মাত্র ১৬ কিলোমিটার। এই সমভূমির পশ্চিম সীমানা হিসাবে ৫০ মিটার কনট্যুর লাইনকে গণ্য করা হয়েছে।

সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে কয়েকটি স্পষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে ভাবর, তরাই, ভাঙ্গর ও খাদার এবং সেই সঙ্গে নদী উপত্যকা।

ভাবর হচ্ছে ৮-১৬ মিটার চওড়া একটি সংকীর্ণ ভূ-বলয় বা কটিবন্ধের মতো একফালি অঞ্চল। মোটামুটি শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর পশ্চিম-পূর্বে সিন্ধু থেকে তিস্তানদী পর্যন্ত

বিস্তৃত। নুড়ি অথবা নুড়ি জড়ানো শিলার আকারে বর্ণহীন প্রস্তরচূর্ণ জমে জমে এর সৃষ্টি। এই অঞ্চল অধিক ছিদ্রযুক্ত বা পোরাস হওয়ার কারণে জলের স্রোত বা প্রবাহ উপরে না হয়ে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই অঞ্চলের নদীখাত বর্ষাকাল বাদে বাকি সময় শুষ্ক প্রবাহে অন্তঃসলিলা থাকে।

তরাই হচ্ছে ভাবরের অনুরূপ হিমালয় পাদদেশে ভাবরের দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত আরও এক ফালি সমতল অঞ্চল, যা ১৫-৩০ কিলোমিটার চওড়া। ভাবরে যে জলপ্রবাহগুলি ভূ-গর্ভস্থ থাকে তা এই অঞ্চলে এসে বহির্গত ও দৃশ্যমান হয় এবং জলাভূমি ও স্যাঁতসেঁতে জমি রচনা করে। এটির নির্মিতি ভাবরের চাইতে তুলনামূলক সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডের চূর্ণ। এই ভূমিকে স্বাভাবিকভাবে আবৃত করে রেখেছে বনভূমি। তরাইয়ের এরূপ অধিকাংশই জমি রূপান্তরিত হয়েছে কৃষিভূমিতে এবং তা পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে দৃশ্য।

খাদার হচ্ছে নদীতীরের বন্যা কবলিত ভূমি বা বন্যাভূমি। নদীসমূহের দ্বারা বাহিত নবতর পলি জমা হতে থাকে এই বলয়ে। ফলে তা জমি হিসাবে খুবই উর্বর। চুনযুক্ত উপাদান না থাকায় এই অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে চাষ হয়।

ভাঙ্গর বা বাঙ্গর হচ্ছে বন্যাভূমির থেকে উঁচুতে থাকা পাললিক সোপান বা ধাপ। এটাই সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমির বৃহত্তর অংশ। এই অংশের মাটি হচ্ছে পুরাতন পলিগঠিত। প্রতিবছর বর্ষায় অথবা বন্যায় নবপলিতে পুনর্নবীকরণ ঘটে না। তাই উর্বরতার দিক থেকে তা খাদারের মতো ততটা উচ্চ নয়। কোথাও এই সমভূমিতে ক্যালকেরিয়াস উপাদান জমতে দেখা যায়, যাকে কঙ্কর বলা হয়।

ভুর হচ্ছে খানিক উঁচুতে অবস্থিত ভৌমাঞ্চল যা গরমে ও শুষ্ক মাসগুলিতে গঙ্গার কিনারা বরাবর বাতাসে তাড়িত বালিয়াড়ির সমাহারে গঠিত হয়। আর রেহ্ বা কল্লার হচ্ছে এমন বন্ধ্যা অঞ্চল যা লবণাক্ততার আধিক্যে রোদে চকচকে প্রস্ফুটিত স্তর হয়ে ওঠে। এটি দেখা যায় উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় শুষ্ক অঞ্চলে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি প্রধানত নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্ল্যানিং কমিশনের শ্রেণিবিন্যস্ত (১৯৮৯) যে ১৫টি কৃষি-জলবায়বীয় অঞ্চল ভারতে রয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে Zone-III : Lower Gangetic Plains Regon। দেখে নেবো এই অঞ্চলের পরিসীমা কীভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই এই অঞ্চলের অন্তর্গত। বাদ কেবল দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলা।

এই অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ১২০০-১৭০০ মিলিমিটার। নিয়মিত পলি জমার কারণে এই অঞ্চলে নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বন্যা পরিস্থিতি বেশি ঘটে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অথবা অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ শেষ বর্ষায়। আর খরা পরিস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় নভেম্বর থেকে জুন মাসের মধ্যে। তাই এখানে কৃষিকাজ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলকে চারটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. বারেন্দ্র ভূমি। ২. কেন্দ্রীয় পরিগঠিত সমভূমি। ৩. পরিগঠিত উপকূলীয় লবণাক্তভূমি। ৪. রাঢ়ভূমি।

বারেন্দ্র সমভূমিটি মূলত দুই দিনাজপুর ও মালদায় অবস্থিত। তার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলার খানিক অংশ জুড়ে আছে। এখানে বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশি, গড়ে সাড়ে পনেরোশো মিলিমিটার। এলাকাটি আর্দ্র, মাটি বাদামি পাহাড়ি।

কেন্দ্রীয় পলিমাটি অঞ্চলটিই মুখ্য (সমগ্র এলাকার ৪০ শতাংশ), আয়তন ৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং অখণ্ড মেদিনীপুর। অঞ্চলের ৬৮ শতাংশ জমি চাষযোগ্য, তার ৬০ শতাংশ সেচ সেবিত। বৃষ্টিপাত প্রায় সাড়ে চৌদ্দশো মিলিমিটার।

ব-দ্বীপীয় পলিমাটি গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র। কৃষি নিবিড়তা ১৩৯ শতাংশ। প্রধান ফসল ধান। পলিগঠিত উপকূলীয় লবণাক্ত ভূমিটি উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ এবং কলকাতাকে ঘিরে গঠিত হয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি, কিন্তু কৃষি নিবিড়তা কম। কৃষিজমির ২৬ শতাংশ সেচসেবিত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬০০ মিলিমিটার। ব-দ্বীপীয় পলিমাটি গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র। রাঢ় অঞ্চলটি তুলনামূলক অনুন্নত। তার গ্রামীণ জীবন দৃশ্য। মূলত বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। এর দুই তৃতীয়াংশ ভূমিতে চাষাবাদ করতে দেখা যায়, ২৩ শতাংশ জমিতে রয়েছে অরণ্য। সেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল। ফসল নিবিড়তা খুবই কম, মাত্র ১১০ শতাংশ।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের ফসল হচ্ছে ধান, পাট, সরষে-রেপসিড, গম, ডালশস্য, আলু, চা। এছাড়া ভূট্টা, ছোলা, চীনাবাদাম, মুসুরি প্রভৃতি চাষ হয়। ফল ও সবজির মধ্যে চাষ হয় আম, কলা, আনারস, বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ট্যাঁড়স, টমেটো প্রভৃতি।

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বোঝাতে কৃষিকার্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কোন অঞ্চলটি বোঝায় এবার দেখে নেবো। সুনির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গ ছয়টি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত।

১. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল যা ভারতের Eastern Himalayan Region-এর অংশ বিশেষ। এর মধ্যে পড়ছে কালিম্পং জেলা এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির কিয়দংশ।

২. তিস্তা-তরাই পলিগঠিত অঞ্চল। এটিও Eastern Himalayan Region-এর অংশ। এর মধ্যে পড়ছে কোচবিহার, দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমা, এবং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের কিয়দংশ।

৩. গাঙ্গেয় পাললিক অঞ্চল। এটি Lower Gangetic Plains Region-এর অন্তর্গত। উত্তর দিনাজপুরের অংশ বিশেষ, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, সমগ্র নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. বিন্ধ্য পাললিক অঞ্চল। এটিও Lower Gangetic Plains Region-এর অন্তর্গত। এর মধ্যে কিয়দংশ হিসাবে পড়ছে মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা।

৫. উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল যা Lower Gangetic Plains Region-এর অন্তর্গত। এর মধ্যে পড়ছে নিম্নলিখিত জেলার কিয়দংশ— উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর।

৬. লাল ও কাঁকুরে মৃত্তিকা অঞ্চল যা Eastern Plateau and Hill Region-এর অন্তর্গত। এর মধ্যে পড়ছে গোটা পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম, তার সঙ্গে পড়ছে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার কিয়দংশ। □

কলকাতায় গঙ্গার ঘাট

অভিমন্যু গুহ

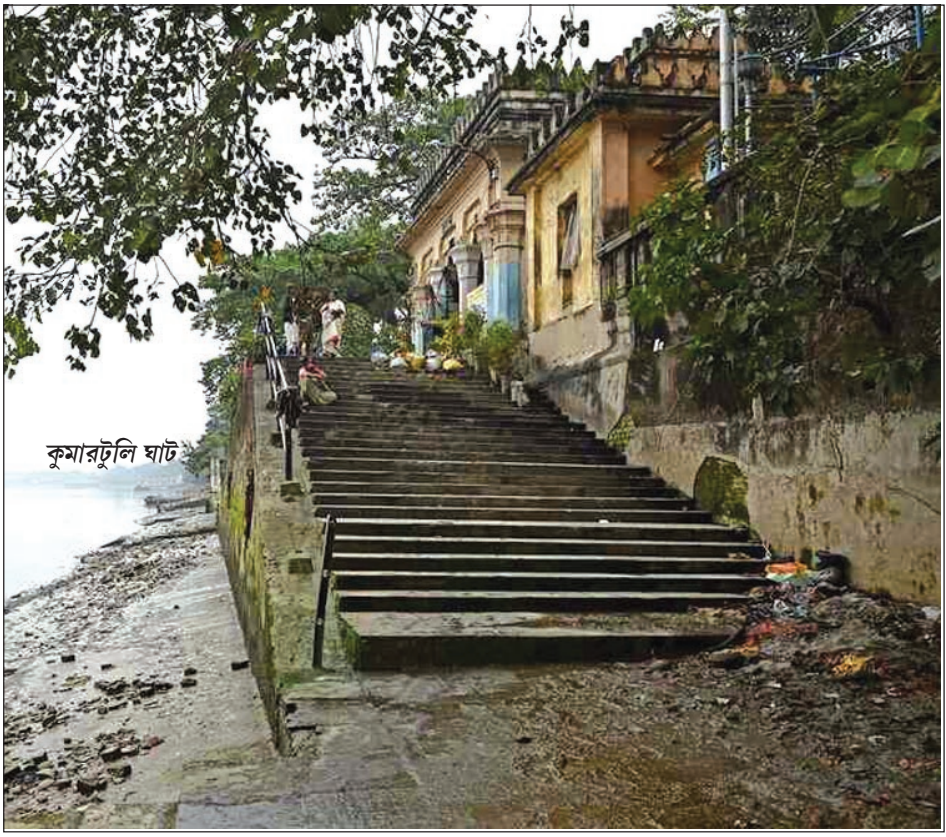
কুমারটুলি ঘাট

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার পশ্চিম পাশ দিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গা প্রবহমান। সুতরাং সাংস্কৃতিক রাজধানীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে গঙ্গার যে সুদূরপ্রসারি ভূমিকা থাকবে, সেকথা তো বলাই বাহুল্য। কলকাতায় গঙ্গার ঘাটের ইতিবৃত্ত একটু জটিল। কারণ কলকাতার ইতিহাস- গবেষক রাধারমণ মিত্র দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে কলকাতার গঙ্গার ঘাটের পরিবর্তন হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই বদল কিন্তু শুধুমাত্র কোনো ঘাটের নামবদলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে ঘাটের অবস্থান বদলও ঘটেছে। কেন এমন হলো? কারণ গঙ্গা কলকাতার ক্ষেত্রে ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরেছে। ফলে বিভিন্ন কালপর্বে ঘাটের অবস্থানও বদল হয়েছে। আপাতত সেই জটিল ইতিহাসের দিকে আমরা যাচ্ছি না। আমরা এমন কিছু ঘাটের কথা এখানে উল্লেখ করলাম যার দ্বারা কলকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জনজীবনে গঙ্গার ঘাটের অবদান সুস্পষ্ট হয় এবং তার ফলে কলকাতার ইতিহাসের রূপরেখাও আমাদের সমনে ফুটে ওঠে। একথাও মাথায় রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্নানের জন্যই কিন্তু গঙ্গার ঘাটের সৃষ্টি হয়নি। শবদাহের জন্য যেমন ঘাট নির্মাণ হয়েছে, তেমনি ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতার ধনী মানুষেরা গঙ্গার ঘাট নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। আবার কোনো ঘাটের নির্মাণ কেবলই হিন্দুত্বের প্রয়োজনে। এই সবরকম ঘাটের কথাই আমাদের আলোচনায় উল্লেখ থাকবে।

বাবুঘাট

জানবাজারে রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র মাড় ১৮৩০ সালে একটি ঘাট তৈরি করেন। নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই ঘাট তৈরির ইতিহাস। কলকাতায় গঙ্গাস্নানের যে ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্যের বড়ো অংশই এই ঘাটকে ঘিরে। রাজচন্দ্রের নামে এই ঘাট নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই থেকে এই ঘাট বাবুঘাট নামে পরিচিত। তব শুধুমাত্র স্নান করার জন্য গঙ্গার ঘাট কলকাতায় আরও বেশ কিছু রয়েছে। যেমন নিমতলায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট শুধুমাত্র পুরুষদের স্নানের জন্য, গিরিশচন্দ্র বসুর ঘাট আবার শুধু মেয়েদের স্নানের জন্য নির্মিত।

বাগবাজার ঘাট

এই ঘাট হলো কলকাতার আদি ও প্রাচীন ঘাট। এই ঘাটটি রঘু মিত্র ঘাট নামে পরিচিত ছিল। কলকাতার নগরয়াণে অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঘাট সে সময় অনেকখানি ভূমিকা রেখেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে বাগবাজারের এই ঘাটের মাধ্যমেই ব্যবসায়িক পণ্য আসা-যাওয়া হতো। বাগবাজার ঘাট ছাড়াও দেশীয় ব্যক্তিদের নামে আরও বেশ কিছু ঘাট অতীতের বাবু গৌরবের কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্মৃতি বহন করছে। যেমন— মদনমোহন দত্তের ঘাট, শোভারাম বসাকের ঘাট, বৈষ্ণবচরণ শেঠের ঘাট, কাশীনাথবাবুর ঘাট, হুজুরীমলের ঘাট ইত্যাদি। এছাড়া এই ঘাটকে পুণ্য ঘাট হিসেবেও মনে করেন হিন্দুরা। বিভিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য এই ঘাট সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। তৎকালীন ব্রিটিশরা সরকারি আর্থিক সহায়তায় এই ঘাট নির্মাণ করেছিলেন।

আর্মেনিয়াম ঘাট

ব্রিটিশদের আগে কলকাতায় এই ঘাট ধরে এসেছিলেন আর্মেনিয়ানরা। ইতিহাস বলছে, আলেকজান্ডার যখন আর্মেনিয়া হয়ে ভারতে এসেছিলেন তখন কিছু আর্মেনিয়ান সেনা আলেকজান্ডার সৈন্যবাহিনী যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন সময় ভারতে এসেছেন।

তাঁরাই ছিলেন প্রথম বিদেশি ব্যবসায়ী। পরে তাঁরা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁদের ব্যবসার জন্য এই ঘাট ব্যবহার হতো বলে ঘাটের নাম হয় আর্মেনিয়ান ঘাট। আর্মেনিয়ান ঘাট ছাড়াও বিদেশিদের নামে আরও কিছু গঙ্গার ঘাট রয়েছে কলকাতায়, যেগুলি মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে তৈরি হয়েছিল। যেমন : রসবিবির ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, ফোরম্যান ঘাট, ব্লাইথ ঘাট, স্মিথ ঘাট ইত্যাদি।

অন্নপূর্ণা ঘাট

১৮৫৬ সালের কলকাতার ম্যাপে প্রথম অন্নপূর্ণা ঘাটের নাম পাওয়া যায়। চিৎপুর থেকে বাগবাজারের যাওয়ার রাস্তায় এই ঘাট। বাগবাজারের বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী হেস্টিংসের আমলে কলকাতার আমিন নিযুক্ত হন, হেস্টিংস বিলেতে যাওয়ার সময় তাঁকে ৫২ বিঘা জমি দান করেন, আর তিনিই ১৭৭৩ সালে (মতান্তরে ১৭৭৬ সাল) ওই জমিতে অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দির থেকে কিছু দূরে ঘাট থাকায় ঘাটটির নাম হয় অন্নপূর্ণা ঘাট। আবার ভিন্ন মতও আছে। অনেকের মতে, এই ঘাট চাল (অন্ন) আমদানি রপ্তানির কেন্দ্র থাকার জন্য এমন নাম হয়েছে। এই ঘাটে চালের ব্যবসা হতো বেশি। চালের অপর নাম অন্ন। আর দেবী অন্নপূর্ণা অন্নেরই প্রতীক।

বলরাম বসু ঘাট

কালীঘাটে অবস্থিত এই গঙ্গার ঘাট। কলকাতার সানতন ধর্মের প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পূজা ১৯১০ সালে এখানেই শুরু হয়। এখানে বাহ্যিক জাঁকজমকের চেয়ে সনাতনী মতে পূজা হয়। প্রসঙ্গত, এই ঘাটেই একসময় সতীদাহ প্রথার চল ছিল। জানা যায়, এই ঘাটেই দুই অভিজাত ব্রাহ্মণ বিধবার সতীদাহ হয়েছিল। তারও ফলক ছিল এই ঘাটে। কিন্তু প্রশাসন ঘাট-সংস্কারের সময় ফলকটি আসল জায়গা থেকে সরিয়ে মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করে।

জগন্নাথ ঘাট

সে সময় কলকাতা থেকে ওড়িশা যাওয়ার রেললাইন চালু হয়নি। রথ উৎসব ছাড়াও পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাত্রীরা এই ঘাট থেকে ব্রিটিশদের জাহাজে উঠতেন। এই পথ দিয়েই দেব দর্শনে যেতেন বলে ঘাটের নাম হয় জগন্নাথ ঘাট।

কুমোরটুলি ঘাট

আঠারো শতকের মাঝামাঝি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় ব্যবসার কারণে মৃৎশিল্পীরা বাস করতে শুরু করেন কুমোরটুলিতে। যেখানে প্রায় সারা বছর সব প্রতিমা গড়ার পাশাপাশি মাটির বাসনকোসন তৈরি হতো। এই কুমোরটুলির সামনে অবস্থিত ঘাটটি নাম পায় কুমোরটুলি ঘাট। গঙ্গাপথে প্রতিমা থেকে মাটির নানা সরঞ্জাম নিয়ে আসা যাওয়ার জন্য এই ঘাট ব্যবহার করা হতো।

নিমতলা ঘাট

গঙ্গার ঘাটে ছিল শ্মশান। ১৮২৮ সালে বাবু রাজচন্দ্র এখানে একটি ঘর করে দেন, মূলত যাদের মৃত্যু হয়নি তবে মৃত্যু আসন্ন, তখনকার রীতি অনুযায়ী তাদের সেই সময় গঙ্গার ঘাটে এনে রাখা হতো। মৃত্যুপথযাত্রী সেই মানুষদের অন্তর্জলি যাত্রায় যাঁরা আনতেন তাঁদের বিশ্রামের ঘরও রাজচন্দ্রেরই তৈরি করে দেওয়া। হিন্দুরীতি অনুযায়ী, মৃত্যুর পর চিতাভস্ম করতে হয় গঙ্গার কোলে। যাতে আত্মার স্বর্গে গমন হয়। গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য এই ঘাট নির্মাণ করেন বাবু রাজচন্দ্র। পরবর্তীকালে নিমতলা ঘাটে আধুনিক শ্মশান তৈরি হয়। নিমতলা ছাড়াও কাশীপুর, কাশীমিত্র ঘাটও শবদাহ করার জন্যে তৈরি।

প্রিন্সেপ ঘাট

এক সময় প্রিন্সেপ ঘাট ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা; সাপ, শেয়ালের রাজত্ব। তবে এখন প্রাতঃ বা সান্ধ্যভ্রমণের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বাবুঘাট নানা রঙের আলোতে মোড়া। সন্ধ্যার পর জ্বলে ওঠে বাতি। রয়েছে নানা প্রজাতির ফুল। কলকাতায় যে ঘাটগুলিতে বেড়ানোর জন্য ভিড় হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রিন্সেপ ঘাট। এখানেই আবার আলাদা নামের একটি ঘাটও রয়েছে, যার নাম জাজেস ঘাট। গঙ্গাবক্ষে নৌবিহারের জন্য এই ঘাটে প্রতিদিন বহু মানুষ হাজির হন। এক সময়ের জঙ্গলের প্রতীক হয়ে এই ঘাটগুলোয় দাঁড়িয়ে আছে ঝুড়িনামা কয়েকশো বছরের একাধিক বট ও অশ্বত্থ গাছ। □

‘বাবুঘাট’-এর নেপথ্যে

তখন ভোর পাঁচটা। ভিস্তিওয়ালারা জানবাজারে রানি রাসমণির বাড়ির সামনের রাস্তাটা ফেয়ারার মতো অবিরল জলের ধারায় ধুয়ে দিচ্ছে। সকাল থেকেই নানা ফেরিওয়ালার ডাক। রাসমণি শয্যাত্যাগ করলেন। শূচিশুভ্র বস্ত্রে ঠাকুরঘরে গিয়ে রাধামাধবের বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। পূজা ও জপ সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আজকে যে তাঁর বড়ো শুভদিন। আজ তাঁর স্বামী বাবু ঁরাজচন্দ্র দাসের স্মৃতিরক্ষার্থে, তাঁর নামানুসারে ‘বাবুঘাট’-এর প্রতিষ্ঠা হবে। আজ তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সফল হবে।

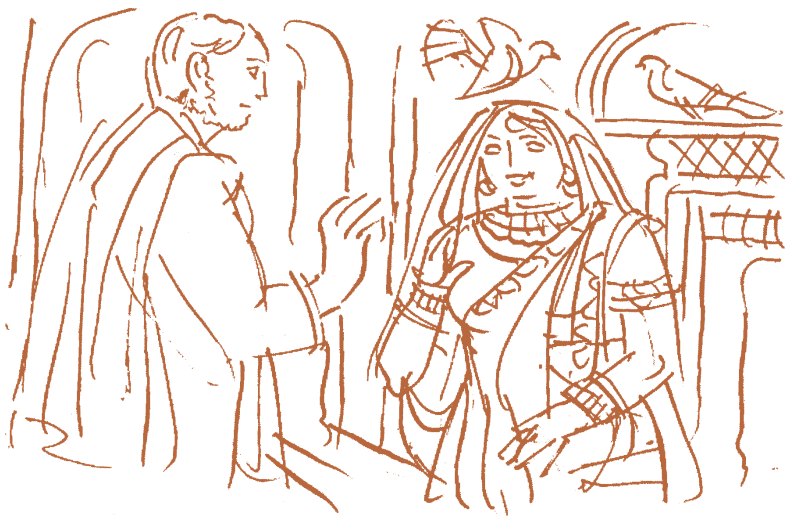

সব কাজেই যাঁর সহযোগিতা ভিন্ন রানিমা চলতে অক্ষম, তিনি হলেন তাঁর জামাতা মথুরামোহন। মথুরামোহনই লোকমুখে মথুরবাবু হয়ে গেছেন। ঘাট প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আজ মথুরবাবুর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে আসার কথা। ‘গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল’—গঙ্গাতীরে পশ্চিমমুখী দক্ষিণেশ্বর মন্দির স্থাপন করে পুরোহিত হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণকে পেয়ে রানিমার অন্তর পরিপূর্ণ।

আজ তাঁর নিরম্বু উপবাস। কেমন যেন মনে হচ্ছে, রাজচন্দ্র যেন আজকে সেই অনেকদিন আগের মতো তাঁর পাশেপাশেই রয়েছেন। দাসী বিমলা গ্লাসে লেবু-চিনির শরবত এনেছে— ‘মা, একফোঁটা চিনির জলে কোনো দোষ নেই। তোমার শরীর তো দুর্বল। একবিন্দু জল না খেয়ে সারাদিন তুমি থাকবে কী করে?

—নারে বিমলি, মা ভবতারিণীর কৃপায় সবই ঠিক থাকবে। ওসব তুই নিয়ে যা।

বিমলা ঘর থেকে বেরিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে চিনির জলটা নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

‘কই গো আমার রানিমা কোথায়? ভবতারিণী মায়ের পূজা শেষ করেই দেখি মথুরবাবু দাঁড়িয়ে আছে। আমায় নিতে এসেছে।’ ঠাকুরের জন্য সচিকত হয়ে রানি রাসমণি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

‘আপনি দেবতা। কোনো শুভকাজ আপনাকে ছাড়া কি করা যায়? আপনি তো যজ্ঞেশ্বর শিব।’ রানির কথায় মৃদু হেসে ঠাকুর চোখ বুজে বললেন, ‘শুনছিস মা, তোর অষ্টসখীর এক সখীর কথা?’

শ্রমিক-খননকারীর বিরাট দল রওনা হলো। রাস্তায় দুধারে বারন্দায় লোকের ভিড়। রানি লোক-লশকর নিয়ে চলেছেন ঘাট প্রতিষ্ঠা করতে। গঙ্গার ধারে পৌঁছে মথুরবাবু বললেন, ‘বাবার মাথায় রোদ লাগছে।’ ঠাকুরের বসার আসনের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বড়ো ছাতা ঠাকুরের মাথায় ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল, জল উঠেছে, জল উঠেছে।

উদ্বেলিত রানির চোখে ভেসে উঠল বহু বছর আগেকার একটি দৃশ্য। এ রকমই আর এক ঘাটে নামছেন কিশোরী রাসমণি আর জলযানে উপবিষ্ট যুবক রাজচন্দ্র ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব। সেখানেই চার চোখের শুভদৃষ্টি। তারপর এক শুভদিনে রাজচন্দ্রের উৎসাহে এবং রানির পিতার উদ্যোগে রাজচন্দ্র-রাসমণির বিবাহ। ইতিহাস কি তাঁকে মনে রাখবে? মনে রাখবে এই বাবুঘাটকে?

রাসমণি ফিরবেন জানবাজারে। পালকি প্রস্তুত। মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে উঠলেন ছ্যাকরা গাড়িতে — গন্তব্য দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘মা, তোমার এই বাবুঘাট অক্ষয় হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, কত লোক নাইছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে, পুজো করছে।’

রাসমণি হাতজোড় করে বললেন, ‘আপনার আশীর্বাদে তাই যেন হয় বাবা।’

রূপশ্রী দত্ত

নদ-নদী পরিচয়

গঙ্গানদী এবং তার উপনদী

গঙ্গানদীর উৎস হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে। মোট দৈর্ঘ্য ২৭০৪ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে ৫২০ কিলোমিটার। সঙ্গমস্থল বঙ্গোপসাগর। গঙ্গা ভারতের জাতীয় নদী। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘতম ও প্রধান নদী। মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কার কাছে আহিরনে বিভক্ত হয়ে একটি ধারা বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মূল ধারাটি মালদা- মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলী জেলা পর্যন্ত ভাগীরথী নামে এবং হুগলী থেকে সাগর মোহনা পর্যন্ত হুগলী নদী নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গানদীর উপনদীগুলি হলো—দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, অজয়।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২০

তস্যা:–তার। কস্যা:–কার। (স্ত্রীলিঙ্গে)
তস্যা: নাম কাবেরী।
কস্যা: নাম কাবেরী?
তস্যা: নাম কিম? তস্যা: নাম চন্দনা।
তস্যা নাম শ্রেয়শী। তস্যা নাম লাবণী। তস্যা নাম স্বর্ণালী।
কস্যা: নাম স্নেহা?
কস্যা: নাম পারমিতা?

প্রয়োগ করি—
তস্যা দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যানি বদতু –
রবিনা, নির্মলা, গায়ত্রী, রচনা, সাগরিকা, সারিকা, হেমা, রমা, চিত্রা, সঞ্চিতা।

ভালো কথা

আমার জন্মদিন

নীলষষ্ঠীর দিন আমার জন্ম। মানে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। ইংরেজি তারিখ ১২ এপ্রিল। এবার সংক্রান্তি ১৩ এপ্রিল ছিল। তাই ১২ তারিখে সকালে মন্দিরে গিয়ে পূজা দিলাম। আবার ১৩ তারিখেও মন্দিরে পূজা দিয়ে এসে গুরুজনদের প্রণাম করলাম। দুপুরে আমার প্রিয় বন্ধু আয়ুষ, ওর মা আর বোন এসেছিল। সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা এল। আমার স্যার এলেন। তারপরেই দেবুদা, সহনদা ও সুকেশদা এলেন। তখন আমরা সবাই বসলাম। বড়োরা আমাকে পায়েস খাইয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমার বন্ধুরা শুভকামনা জানালো। দেবুদা 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গান ধরলেন। সবাই আমরা গাইলাম। তারপর আমার মা, মাসি আর আয়ুষের মা সবাইকে খাবার পরিবেশন করলেন। জন্মদিনে প্রতি বছরই খুব আনন্দ হয় কিন্তু এবার শাখার বন্ধুরা আসায় আনন্দ একটু বেশি হলো।

নীল সুর, নবমশ্রেণী, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

রামনবমী

বিশ্বজিৎ চৌধুরী, দ্বাদশশ্রেণী, শিলচর, অসম।

রামনবমীতে অযোধ্যায় ঠিক দুপুর বারোটায়
সূর্যিঠাকুর তিলক এঁকে দিলেন কপালটায়।
রামলালার কপাল তখন উজল রবিকরে
দেশ-বিদেশের ভক্তরা সব দেখেন ভক্তিভরে।
রামনবমীর পুণ্যদিনে রামনামের জোয়ার
প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনের মতো মেতে উঠল আবার
প্রতিবার হয় রামনবমী বিশেষ কিন্তু এবার
রামলালা যে আপন ঘরে ঠাঁই নিয়েছেন আবার

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

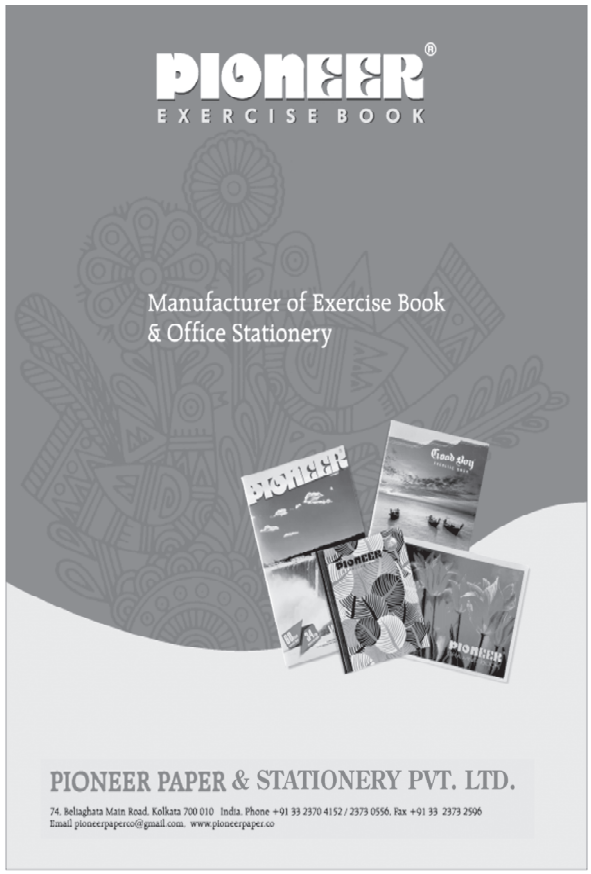

With Best Compliments from -

A
Well wisher

গঙ্গাপাড়ের একটি যুদ্ধের কথা

হীরক কর

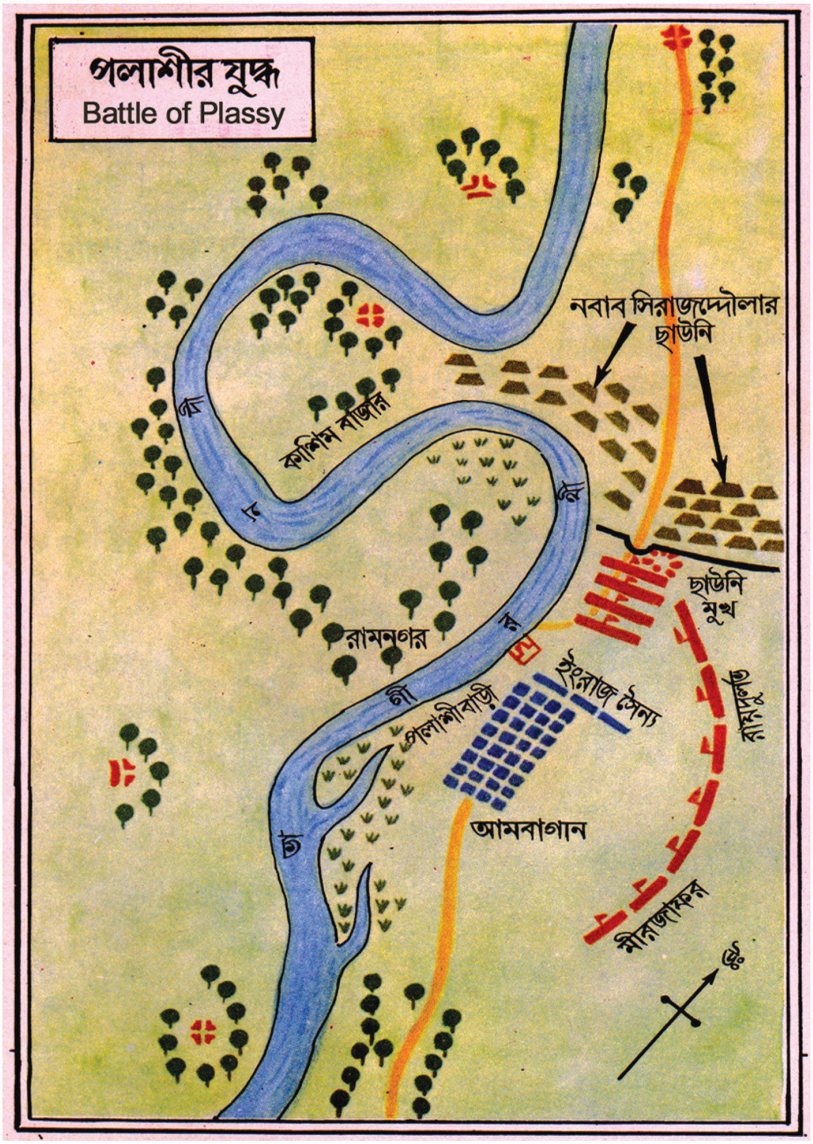

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন দাঁড়িয়ে আছেন বজরার ছাদে। ছাদ না বলে আপার ডেকই বলা যায়। একটা বড়ো সেগুন কাঠের ইজি চেয়ারে আধা শোয়া ক্লাইভ। ঢুলুঢুলু চোখ। গড়গড়ার নলে তামাকের মৌতাত জমে উঠেছে। একটু দূরে ডেকের দরজার কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে নবকৃষ্ণ দেব। ক্লাইভের মুন্সি। হাত দুটো সামনে জড়ো করা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পেল্লাই বজরা বরানগর ঘাট থেকে ছেড়ে তির তির করে মাঝ গঙ্গার বুক চিরে চলেছে। হুগলি অভিমুখে। রবার্ট ক্লাইভ অবশ্য এই নদীকে হুগলি নদী বলাই বেশি পছন্দ করেন। হঠাৎ উঠে বসলেন ক্লাইভ। বললেন, নবাবের বেয়াদপি আর সহ্য হচ্ছে না ওয়াটসন। হিন্দু-মুসলমান কোনো মেয়ে-বউকেই ছাড়ছেন না নবাব। বাঙ্গালির ঘরে মেয়ে-বউ রাখার উপায় নেই। যাকে পারছে তাঁকে মুর্শিদাবাদের হারেমে নিয়ে তুলছে। তাদের আর্তনাদের শেষ নেই। কোম্পানির কাছে নানা বায়নাক্কা সিরাজের। ওইটুকু ছেলের দেমাক কম নয়। প্রতিদিন ফোর্ট উইলিয়ামে হাজারো অভিযোগ আসছে। এবার এই ছোকরাকে শায়েস্তা করতেই হবে। কিন্তু—বললেন ওয়াটসন।

কিন্তু কী? ওয়াটসন বললেন, সে ক্ষেত্রে বাধ সাধবে চন্দননগরের ফরাসিরা। নবাব ইতিমধ্যেই ফরাসি জেনারেল ডি বুসির সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করেছেন। সিরাজ ভাবছে মুর্শিদাবাদ রক্ষা করবে ফরাসিরা। ফিক করে হেসে ফেললেন ক্লাইভ---তাহলেই হয়েছে, তবে তুমি চন্দননগরকে গুঁড়িয়ে দাও। পিছন থেকে নব মুন্সি বলে উঠলেন---ঠিক কইছেন কর্তাহুজুর। ফরাসিদের বাঙ্গলা ছাড়া করতে হবে।

ধরিত্রী সৃষ্টির পর থেকে বয়ে চলেছে পতিত পাবনী গঙ্গা। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর। বয়ে চলার পথে তার দু'পাশে কম যুদ্ধ দেখেনি সে। বারাণসী থেকে তিরিশ কিলোমিটার চুনার। চুনার দুর্গ চন্দ্রকান্ত চুনারগড় ও চরণাদ্রি নামেও পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত। দুর্গের নীচে অবস্থিত দুটি ঐতিহাসিক স্থান যাকে ঘিরে সাধারণ ইতিহাস ও কিংবদন্তী রয়েছে। চুনার মির্জাপুর থেকে ৩৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব অংশটি গঙ্গার পাথুরে তীরে অবস্থিত। দুর্গের ইতিহাস বিস্তৃত ৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। আফগান শাসক শেরশাহ সুরির শাসন ১৫৩২ সাল পর্যন্ত। ১৭৭২ পর্যন্ত মুঘল শাসন। হুমায়ুন, আকবর ও অওধের নবাব সহ আরও অনেকে এখানকার শাসনভার সামলেছেন। ১৭৮২ থেকে

১৮০৪ সাল পর্যন্ত মরাঠাদের অধীনে ছিল চুনার দুর্গ। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন ব্রিটিশের দখলমুক্ত হয়।

চুনারের রাজা তার সমৃদ্ধ ধনসম্পদ দুর্গের মধ্যেই পুঁতে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে ব্রিটিশ শাসক তাদের কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নেবে। সঞ্জীব সান্যালের ল্যান্ড অব সেভেন রিভারস : হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'স জিওগ্রাফি বইতে চুনারের ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি লিখেছেন, ''একবার বলা হয়েছিল যে চুনার দুর্গকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তিনি ভারতের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।'' দুর্গের মধ্য দিয়ে হাঁটা মানে ভারতীয় ইতিহাসের একটি পথচলা। দেওয়ালগুলো কিংবদন্তী রাজা বিক্রমাদিত্য, মুঘল, শেরশাহ সুরি এবং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাহিনি প্রতিধ্বনিত করে।

প্রয়াগরাজ শহরটির নাম ১৫৮৩ সালে মুঘল বাদশা আকবর পরিবর্তন করেন। তিনি এটির নামকরণ করেছিলেন এলাহাবাদ বা ইলাহাবাদ। যা ১৫৯৯ থেকে ১৬০৪ সাল পর্যন্ত মুঘল শাসনের সময় প্রাদেশিক রাজধানী হয়ে ওঠে।

এলাহাবাদ দুর্গ আকবরের নির্মিত বৃহত্তম দুর্গ। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ফিঞ্চের মতে, ''দুর্গটি তৈরি করতে চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার শ্রমিক লেগেছিল''। ১৬০০ সালে, মুঘল শাহজাদা সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এলাহবাদ দুর্গে তার নিজস্ব আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বিদ্রোহী সেলিমের সদর দফতর ছিল। প্রয়াগরাজ দুর্গের বাইরে সেলিম বা জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহীপুত্র খসরুর জন্য নির্মিত সমাধি রয়েছে।

গঙ্গার ধারে ধারে আরও দক্ষিণে এগোলে শস্যশ্যামল সবুজ ভূমি ধরে এগিয়ে চলেছে ভাগীরথী। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে বসে রবার্ট ক্লাইভ আর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন গোটা ভারতে রাজত্ব করার স্বপ্ন দেখছেন।

১৭৫৬ সালের ২০ জুন। কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম গুঁড়িয়ে দিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। বিপর্যস্ত ইংরেজরা পালিয়ে গেল ফলতায়। বাঙ্গলার বাণিজ্য পুনরুদ্ধারে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে এলেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ জিতে নিয়ে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের গতিমুখ সম্পূর্ণ বদলে দিল ইংরেজরা। 'বণিকের মানদণ্ড ও দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'।

বাঙ্গলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। তিনি তাঁর মাতামহ আলীবর্দী খানের স্থলাভিষিক্ত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা এক বছরের জন্য বাঙ্গলার নবাব হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজদের তাদের কলকাতার দুর্গের সম্প্রসারণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা আক্রমণ এবং ব্ল্যাক হোল হত্যাকাণ্ড। ব্রিটিশরা কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ এবং অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসনের অধীনে মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গলায় শক্তিবৃদ্ধি করতে সেনা পাঠায়। কলকাতা পুনরুদ্ধার করে। ক্লাইভ তখন চন্দননগরের ফরাসিদুর্গ দখলের উদ্যোগ নেন। ফরাসিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি ছোটো দল পাঠায়। সিরাজ-উদ-দৌলার সংখ্যাগতভাবে বিশাল শক্তি ছিল। তিনি পলাশীতে অবস্থান করছিলেন। সংখ্যায় বেশি হওয়ার জন্য চিন্তিত ব্রিটিশরা, সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাপ্রধান মীরজাফর, ইয়ার লুৎফ খান, জগৎ শেঠ, মাহতাব চাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভের মতো অন্যদের সঙ্গে একটি ষড়যন্ত্র রচনা করে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার লুৎফ খান যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে তাদের সৈন্যদের একত্রিত করেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি। প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য (দলত্যাগী সহ), ৪০টা কামান ও ১০টা যুদ্ধ হাতি নিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনী কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের ৩,০০০ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কারণ, সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া। তার সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রায় ১১ ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে।

এটিকে ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নবাব মীরজাফরের উপর ব্রিটিশদের তখন অনেক প্রভাব ছিল এবং এর ফলে তারা আগের ক্ষতি এবং বাণিজ্য আয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছাড় পেতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশরা তাদের সামরিক শক্তি বাড়াতে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন ডাচ ও ফরাসিদের দক্ষিণ এশিয়া থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এই মীরজাফরকে ব্যবহার করেছিল।

'বেঙ্গল সুবাহ'। 'মুঘল বেঙ্গল' হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। এটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম প্রদেশ এবং পরে বাঙ্গলার নবাবের অধীনে একটি রাজ্য। যা আধুনিক বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত। ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত রঘুজী ভোঁসলের অধীনে মরাঠারা ছয়বার বাঙ্গলা আক্রমণ করেছিল। ১৭৫১ সালে, মরাঠারা বাঙ্গলার নবাবের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার অনুসারে আলিবর্দী খানের একজন প্রাক্তন দরবারি মীর হাবিব মরাঠাদের দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং বাংলার নবাবের নামমাত্র নিয়ন্ত্রণে উড়িষ্যার প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হন।

অ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধের পর থেকে মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং পশ্চিম ভারতে বোম্বে ক্যাসেলের তিনটি প্রধান কেন্দ্র সহ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রগুলো ছিল স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি। ইংল্যান্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরস ছাড়াও বোর্ড অব কন্ট্রোল দ্বারা নিযুক্ত একজন প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর জেনারেলস কাউন্সিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্রিটিশরা দখলদার ও বিদ্রোহীদের থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন রাজপুত্র ও নবাবদের সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেছিল। নবাবরা প্রায়ই নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের ছাড় দিতেন।

১৮ শতকের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিপক্ষদের এবং ডাচ বা পর্তুগিজদের মধ্যে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ হয়ে যায়। ফরাসিরা চতুর্দশের লুইয়ের অধীনে একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ভারতে তাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল— বাঙ্গলার চন্দননগর ও কর্ণাটক উপকূলে পণ্ডিচেরি, যা বর্তমানে পুদুচেরি জেলা। উভয়ই পণ্ডিচেরির প্রেসিডেন্সি দ্বারা শাসিত। ফরাসিরা ভারতে বাণিজ্যে করতে পরে এসেছিল। কিন্তু তারা দ্রুত ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

১৮৫৬ সালের ১৬ আগস্ট মাদ্রাজে কলকাতার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ কাউন্সিল অবিলম্বে কর্নেল ক্লাইভ এবং অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। ফোর্ট সেন্ট জর্জের কাউন্সিলের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে ''অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কেবল বাঙ্গলায় ব্রিটিশ বসতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং কোম্পানির বিশেষ সুযোগসুবিধা এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করা।''। ক্লাইভ ৯০০ ইউরোপীয় এবং ১৫০০ জন দেশি সিপাহি নিয়ে গঠিত স্থলবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন এবং ওয়াটসন একটি নৌ স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দেন। নৌবহরটি ডিসেম্বরে হুগলি নদীতে প্রবেশ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর ফলতা গ্রামে কাউন্সিলের প্রধান সদস্য-সহ কলকাতা ও আশেপাশের এলাকার ইংরেজ পলাতকদের সঙ্গে দেখা করে। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্দেশনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। ২৯ ডিসেম্বর, বাহিনী বজবজের দুর্গ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করে। ক্লাইভ ও ওয়াটসন ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। কলকাতা পুনরুদ্ধার করা হলে কাউন্সিল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবাবের বিরুদ্ধে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয় ব্রিটিশ।

ব্রিটিশরা নদীপথে বেশ কয়েকটি ফরাসি

জাহাজ ডুবিয়েছিল। ফরাসিরা হুগলি থেকে নবাবের বাহিনীর সাহায্য আশা করেছিল, কিন্তু হুগলির গভর্নর— নন্দকুমারকে নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য এবং চন্দননগরে নবাবের শক্তিবৃদ্ধি রোধ করার জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন ক্লাইভ। ২৩ মার্চ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের স্কোয়াড্রন গঙ্গা অবরোধ করতে শুরু করে। তখন তীরে একটি ভয়ংকর কামান তৈরি করা হয়েছিল। চন্দননগর দুর্গ থেকে মাস্কেট-ফায়ারের কারণে নৌ স্কোয়াড্রন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৪ মার্চ সকাল ৯টায় ফরাসিদের দ্বারা যুদ্ধবিরতির একটি পতাকা দেখানো হয়। বেলা তিনটে নাগাদ তারা আত্মসমর্পণ করে। চন্দননগর লুণ্ঠন করার পর ক্লাইভ মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার আদেশ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার সৈনাবাহিনীকে হুগলি শহরের উত্তরে নিয়ে যান।

সিরাজ-উদ-দৌলা বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল বাদশা দ্বিতীয় আলমগিরের কাছ থেকে বাঙ্গলার নবাবের অঞ্চলে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কোনো অনুমতি পায়নি। চন্দননগর আক্রমরের খবর পেয়ে নবাব ক্ষুব্ধ হন। ব্রিটিশদের প্রতি তার পূর্বের ঘৃণা ফিরে আসে, কিন্তু তিনি তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে নিজেকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুভব করেন। আহমদ শাহ আবদালির অধীনে আফগানদের থেকে এবং মরাঠাদের দ্বারা পশ্চিম থেকে আক্রমনের ভয়ে নবাব জর্জরিত ছিলেন। তাই, পাশ থেকে আক্রমণের ভয়ে তিনি তার পুরো বাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মোতায়েন করতে পারেননি। ব্রিটিশ ও নবাবের মধ্যে সেই সময় গভীর অবিশ্বাস। ফলস্বরূপ, সিরাজ কাশিমবাজারের ফরাসি সেনার প্রধান জাঁ ল এবং ডি বুসির সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ৪৮ কিমি দক্ষিণে পলাশীতে রায়দুর্লভের অধীনে নবাব তার সেনাবাহিনীর একটি বড়ো ডিভিশন নিয়ে যান।

নবাবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তার নিজের দরবারেই বেড়ে ওঠে। আলিবর্দীর শাসনকালের পরিস্থিতির বিপরীত হয়ে যায়। বাঙ্গলার ব্যবসায়ী-শেঠরা সিরাজের শাসন আমলে তাদের সম্পদ রক্ষার জন্য চিরকাল ভয়ে ছিল। তারা কোনোভাবে হুমকির সম্মুখীন হলে ইয়ার লুৎফ খানকে তাদের রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেছিল। সিরাজের দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম ওয়াটস ক্লাইভকে নবাবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের কথা জানান। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মীরজাফর, সেনাপতি মাস্টার রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ও উমিচাঁদ, সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগম, একজন বণিক এবং সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাইভ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি কমিটির কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

১৭৫৭ সালের ১ মে জোটের সমর্থনে কমিটি প্রস্তাব পাশ করে।

ব্রিটিশ ও মীরজাফরের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যথেষ্ট আর্থিক প্রণোদনার বিনিময়ে। তাঁকে নবাবকে উৎখাত করতে সাহায্য করার জন্য। ইতিহাসবিদ ডব্লিউ ডালরিম্পলের মতে, জগৎ শেঠরা ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ৪ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ২ মে, ক্লাইভ তাঁর শিবির ভেঙ্গে অর্ধেক সৈন্যকে কলকাতায় এবং বাকি অর্ধেককে চন্দননগরে পাঠান।

মীরজাফর ও জগৎ শেঠরা চেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ এবং নিজের মধ্যে চক্রান্তের কথা উমিচাঁদের কাছে গোপন রাখা হবে। কিন্তু যখন উমিচাঁদ এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার হুমকি দেন। বলেন, তাঁর ভাগ ত্রিশ লক্ষ টাকা বাড়াতে হবে। এই কথা শুনে ক্লাইভ কমিটির কাছে একটি সমীচীন প্রস্তাব করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে দুটি চুক্তি করা হোক— আসল একটি সাদা কাগজে, যেখানে উমিচাঁদের কোনো উল্লেখ নেই এবং অন্যটি লাল কাগজে, যাতে উমিচাঁদের কাঙ্ক্ষিত শর্ত রয়েছে, তাঁকে প্রতারিত করার জন্য। কমিটির সদস্যরা উভয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু অ্যাডমিরাল ওয়াটসন শুধুমাত্র আসলটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তাঁর স্বাক্ষরটি কাল্পনিক চুক্তিতে জাল করতে হয়েছিল। উভয় চুক্তি এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর স্কোয়াড্রন ও কমিটিকে অনুদানের জন্য পৃথক চুক্তিপত্র ৪ জুন মীরজাফর স্বাক্ষর করেছিলেন। নবাবের সেনাবাহিনী ক্লাইভের আসার ২৬ ঘণ্টা আগে থেকে পলাশীতে ছিল। জাঁ ল-এর অধীনে একটি ফরাসি দল দুই দিনের মধ্যে পলাশীতে পৌঁছাবে বলে নবাবের আশা ছিল। তাঁরা এসেও ছিলেন।

২৩ জুন ভোরবেলা নবাবের বাহিনী তাদের শিবির থেকে বেরিয়ে আসে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের সেনাবাহিনীতে ৩০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। ম্যাচলক, তলোয়ার, পাইক, রকেট এবং ২০,০০০ অশ্বারোহী, তলোয়ার বা লম্বা বর্শা দিয়ে সজ্জিত। ৩০০ টি কামান ছিল। বেশিরভাগই ৩২, ২৪ পাউন্ডার এবং ১৮টি কামান। সেনাবাহিনীতে ডি সেন্ট ফ্রেসের অধীনে প্রায় ৫০ জন ফরাসি আর্টিলারি সৈন্যদের একটি বিচ্ছিন্ন দল ছিল। ফরাসিরা পলাশীর প্রান্তরের এক মাইলের মধ্যে বড়ো পুকুরের ধারে অবস্থান নেয়। তাদের পিছনে ছিল নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন এবং দেওয়ান মোহনলালের নেতৃত্বে ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং ৭,০০০ পদাতিক বাহিনী। বাকি ৪৫,০০০ সৈন্যদল দক্ষিণ কোণ থেকে ৭৩০ মিটার পূর্বে একটি চাপ তৈরি করে। যা ক্লাইভের অপেক্ষাকৃত ছোটো সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলার হুমকি দেয়। তাদের সেনাবাহিনীর ডান দিকে ছিল রায়দুর্লভ, কেন্দ্রে ছিল ইয়ান লুৎফ খান এবং বাম দিকে ব্রিটিশদের সবচেয়ে কাছের মীরজাফর।

ক্লাইভ মীরজাফরের কাছ থেকে খবরের আশায় বজরার ছাদ থেকে পরিস্থিতি দেখছিলেন। তিনি তার সৈন্যদের অগ্রসর হতে এবং বৃহত্তর পুকুরের দিকে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন। তার সেনাবাহিনীতে ১০০ টোপাস, ২১০০ সিপাহি এবং ৫০ জন নাবিকের সহায়তায় ১০০ জন আর্টিলারি-সহ ৭৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক বাহিনী ছিল। আর্টিলারি ছিল আটটি সিক্স-পাউন্ডার এবং দুটি হাউইটজার কামান নিয়ে গঠিত। ইউরোপীয় ও টোপাসদের চারটি বিভাগে স্থাপন করা হয়েছিল, উভয় পাশে তিনটি সিক্স-পাউন্ডার ছিল। সিপাহিদের ডানে-বামে সমান ডিভিশনে রাখা হয়েছিল। ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনী মোকাবিলায় ক্লাইভ তার সেনাবাহিনীর বাম বিভাগের ১৮০ মিটার উত্তরে কয়েকটি ইটভাটার পিছনে দুটি সিক্স-পাউন্ডার এবং দুটি হাইটজার কামান পোস্ট করেছিলেন।

ওইদিন সকাল ৮টায় ফরাসি আর্টিলারি প্রথম গোলাগুলি চালায়। ব্রিটিশদের ৩৯ তম রেজিমেন্টের গ্রেনেডিয়ার কোম্পানির একজনকে হত্যা করে। অন্য একজনকে আহত করে। নবাবের বাকি কামানগুলো একটি ভারী এবং অবিরাম গোলা বর্ষণ শুরু করে। ব্রিটিশ ফিল্ড সেনারা ফরাসি ফায়ারের জবাব দিচ্ছিল। যারা নবাবের বাকি কামানগুলোর জবাব দিচ্ছিল। তাদের শট আর্টিলারিকে প্রতিহত করার জন্য কাজ করেনি। কিন্তু পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীকে আঘাত করেছিল। সাড়ে আটটা নাগাদ, ব্রিটিশরা ১০ জন ইউরোপীয় এবং ২০ জন দেশি সিপাহিকে হারিয়েছিল। ইটের ভাটায় উন্নত আর্টিলারি রেখে ক্লাইভ সেনাবাহিনীকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ভেড়িবাঁধ রক্ষার কারণে ব্রিটিশদের হতাহতের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়।

তিন ঘণ্টা পরও যুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। উভয় পক্ষের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্লাইভ সামনের পথ নিয়ে আলোচনা করার জন্য তার সেনাকর্মীদের একটি সভা ডাকেন। সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বর্তমান অবস্থান রাত না হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকবে। মধ্যরাতে নবাবের শিবিরে অতর্কিতে আক্রমণের চেষ্টা করা উচিত। বৈঠকের পরপরই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ব্রিটিশরা তাদের গোলাবারুদ রক্ষার জন্য টারপলিন ব্যবহার করত। কিন্তু, নবাবের সেনাবাহিনী এই ধরনের কোনো সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলস্বরূপ, তাদের সমস্ত বারুদ ভিজে যায় এবং তাদের গোলাবর্ষণের তীব্রতা হ্রাস পায়, তখন ক্লাইভের আর্টিলারি অবিরাম গোলা বর্ষণ করতে থাকে। বৃষ্টি কমতে শুরু করলে, মীরমদন অনুমান করে যে ব্রিটিশ বন্দুকগুলো বৃষ্টির কারণে অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান। ব্রিটিশরা প্রচন্ড আঘাতে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে মীরমদনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। মীরমদনের বাকি সেনারা পিঠটান দেয়।

জয়ের আশ্বাস নিয়ে সিরাজ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে মীরমদন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, তখন তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। মীরজাফরের সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। □

নির্বাচনী বন্ড যদি অসাংবিধানিক হয় তাহলে সুষ্ঠু ব্যবস্থা কী ?

শীর্ষ আদালতকেই বলতে হবে এর থেকে শ্রেয়তর ব্যবস্থা কী। অভিভাবকত্ব করতে হলে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। পূর্বাবস্থায় ফেরা যাবে না। শীর্ষ আদালত না হয় বলুন একটি ভালো ব্যবস্থা।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২০১৮ সলের ২ জানুয়ারি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলের অন্যতম উৎস হিসেবে ক্রেতা ও গ্রহীতার নামবিহীন 'নির্বাচনী বন্ড' চালু হয়েছিল। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত একে 'সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) (ক) অনুসারে রাজনৈতিক তহবিল সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘন' বলে ঘোষণা করেছে। আদালত আরও বলেছে যে এটা কর্পোরেট ও রাজনীতিকদের মধ্যে অনভিপ্রেত 'আদানপ্রদান' ব্যবস্থা চালু করবে। আদালতের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। দলগুলোর (প্রথম পাঁচ বছরে) প্রাপ্ত অর্থ (কোটি টাকায়) বিজেপি— ৬৯৮৬.৫ কোটি টাকা; টিএমসি— ১৩৯৭ কোটি; কংগ্রেস— ১৩৩৪.৫ কোটি টাকা; ভারত রাষ্ট্র সমিতি— ১৩২২ কোটি; বিজেডি— ৯৪৪.৫ কোটি; ডিএমকে— ৬৫৬.৫ কোটি; ওয়াইএসআর কংগ্রেস— ৪৪২.৮ কোটি; টিডিপি— ১৮১.৩৫ কোটি; সমাজবাদী পার্টি— ১৪.০৫ কোটি, অকালি দল— ৭.২৬ কোটি, এআইএডিএমকে— ৬.০৫ কোটি, ন্যাশনাল কনফারেন্স— ৫০ লক্ষ। বিএসপি, সিপিআই, সিপিআই (এম) এবং এআইএমআইএম— শূন্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে বহুদলীয় গণতন্ত্র একটি পরিণত রূপ পরিগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব বিস্তৃত হয় নির্বাচনী রাজনীতিতে। নির্বাচন হয়ে ওঠে ব্যয়বহুল এবং নির্বাচনে জয়ী শাসকদলের অনুগ্রহ লাভে উৎসাহী হয়ে ওঠে দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল। নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পিছনে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাদের জয়যুক্ত করার বিনিময়ে প্রদত্ত পুঁজির শতগুণ অর্থ এবং নির্বাচিত সরকারের থেকে নানা ভাবে সুবিধা আদায় করে নেওয়া অবাধে চলতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই আইনি আঁচ এড়ানোর জন্য অধিকাংশ লেন-দেন চলতো নগদে এবং সেই বিপুল অর্থ থেকে যেত সরকারি হিসেব নিকেশের বাইরে। এইভাবে একটি কালো-টাকা কেন্দ্রিক সমান্তরাল অর্থনীতি দাপিয়ে বেড়াত রাজনীতির আঙিনায়। ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ নগদে নেওয়া হবে, তার বেশি অর্থ নিতে হবে চেকে— এই সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভোট রাজনীতির রমরমা চলতে থাকে।

ইলেক্টোরাল বন্ড এক ধরনের প্রমিসরি নোট। ভারতীয় নাগরিক বা ভারতে নিবন্ধিত সংস্থা কেওয়াইসি শর্ত পূরণ করে এই বন্ড কিনতে পারে দাতা-গ্রহীতার নাম ছাড়াই, এসবিআই-এর নির্দিষ্ট শাখা থেকে জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রথম ১০ দিন, এক হাজার, দশ হাজার, এক লক্ষ, দশ লক্ষ এবং এক কোটি টাকা মূল্যের, চেক বা ডিজিটাল অর্থপ্রদানের মাধ্যমে এবং কোনো বৈধ রাজনৈতিক দল, যে গত নির্বাচনে কমপক্ষে ১ শতাংশ ভোট পেয়েছে তাকে দিতে পারে এবং সেই দলটি ১৫ দিনের মধ্যে তা নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাঙাতে পারে। নতুবা সেটা প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে জমা হবে।

নির্বাচন কমিশন ও আয়কর বিভাগ দেখেছে সরকারি তহবিল অবৈধভাবে রাজনৈতিক কাজে লাগানো হচ্ছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় 'কালো টাকা'র সমস্যা নিরসন করে জেটলি বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন ও রাজস্ব দপ্তরের পদক্ষেপে ১৫০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভারতে রাজনৈতিক অর্থায়ণের পরিচিত উৎস : ব্যাংক সুদ, সদস্যদের চাঁদা, লেভি, সম্পদ বিক্রি, বই বিক্রি ও ২০০০০ টাকার বেশি স্বেচ্ছাদান। অজানা উৎস : মিটিং/মোর্চা থেকে অনুদান, নির্বাচনী বন্ড, বিবিধ আয়, ত্রাণ তহবিল, কুপন বিক্রি ও ২০০০০ টাকার কম স্বেচ্ছাদান।

নতুন নিয়ম : ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত নগদ অনুদানের সীমা আগের ২০০০০ টাকার পরিবর্তে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। অনুদানের সর্বোচ্চ

সীমা নেই, আগে কোনো কর্পোরেট পূর্ববর্তী তিন বছরে গড় আয়ের ৭.৫ শতাংশ বেশি অনুদান দিতে পারত না। ব্যক্তি বা কর্পোরেট রাজনৈতিক অনুদানের তথ্যপ্রদানে বাধ্য নয়, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিটি রাজনৈতিক অনুদান না বলে কোম্পানিগুলোকে এখন কেবলমাত্র মোট নির্বাচনী বন্ডের পরিমাণ প্রকাশ করতে হয়। আগে ২০০০০ টাকার বেশি অনুদান দিলেই তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

সমালোচকদের আপত্তি এই পরিবর্তনে যে কোনও ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এখন বেনামে কোনও রাজনৈতিক দলকে যথেচ্ছ টাকা দেবে। সর্বোচ্চ দাতা সান্তিয়াগো মার্টিন পরিচালিত লটারি কোম্পানি ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৯-২৪ এর মধ্যে ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। মানি লন্ডারিঙের অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বৃহত্তম দাতা— মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড এবং বেদান্ত লিমিটেড— এই পর্বে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের মুখে পড়েছিল। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগী পিআইএলটি ২০১৭-এর অক্টোবরে শুরু হয়েছিল কিন্তু রিলায়েন্স পিআইএলটি যোগের কথা অস্বীকার করেছে।

সমস্ত রাজনৈতিক দল তহবিলের উৎস চেপে রাখে, 'কালো টাকা' অবৈধ তহবিল রাখে। আশ্চর্যের বিষয় এই তহবিল বরাদ্দের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভারতের আইনে নেই অথচ এটাও পেজ সিক্রেট যে দল চালাতে বিশাল টাকা লাগে এবং কোনো আইনে তহবিল বন্ধ করা যাবে না, করলে দলীয় গণতন্ত্র উঠে যাবে। ফলে নির্বাচনী অর্থ ও ব্যয় দুর্নীতিপূর্ণ, হিসাববিহীন তহবিল বিস্তারের প্রধান অনুঘটক, ভারতীয় রাজনীতিতে কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত।

মোদী সরকারই প্রথম নগদে অনুদান কমিয়ে ও 'নির্বাচনী বন্ড' প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক তহবিলের সমস্যা মোকাবিলার সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিছু রাজনীতিবিদ বলছেন স্বচ্ছতার অভাবে রাজনীতির আর্থিক দিকগুলো সম্পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন। কোম্পানিগুলো বেনামে রাজনৈতিক দলগুলোকে লাগামছাড়া টাকা দিচ্ছে। এটা কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে অত্যধিক প্রভাবশালী করে, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যে কী দেওয়া-নেওয়া হয় তা অস্পষ্ট থাকে।

ব্যক্তিগত বন্ডের ক্রেতা ও প্রাপকদের সম্পর্কে সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ডকুমেন্টেশনের অভাব রয়েছে। স্বচ্ছতার অভাবে বন্ডগুলিকে 'অসাংবিধানিক ও সমস্যাযুক্ত' বিবেচনা করা উচিত, এটা করদাতা ও নাগরিকদের অনুদানের উৎস সম্পর্কে তথ্যঅর্জনে বাধা দেয়। বন্ড পুরোপুরি বেনামি নয় যেহেতু এসবিআই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক দাতা গ্রহীতা উভয়েরই সব রেকর্ড রাখে, ফলত তা ক্ষমতাসীন সরকারকে অনায়াসে প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে এবং দাতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে। এটা ক্ষমতাসীন দলকে অন্যান্য সুবিধা দেয়। নির্বাচনী বন্ড তহবিল, ভোটারদের আধার, জনধন অ্যাকাউন্ট নম্বর, দল ও সরকার উভয়েরই দখলে থাকে। সেই দল সম্ভাব্যভাবে নির্বাচনের আগে ভোটারদের অ্যাকাউন্টে তহবিলের টাকা 'ডায়রেক্ট- বেনিফিট-ট্রান্সফার' করতে পারে। এমনকী শুধুমাত্র ইউপিআই নম্বরগুলির সাহায্যে বেনামি উৎস থেকে বেনামি ভোটারদের কাছে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা যাওয়া সম্ভব। শেষাবধি নির্বাচন 'মুক্ত', 'নিরপেক্ষ' থাকে না। উপরোক্ত আপত্তিগুলো ধোপে টেকে না, কারণ আগে যে টাকা নেওয়া হতো তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকত না। কে দেখতে যেত কত টাকা ২০০০০ টাকার নীচে দেওয়া হতো? নির্বাচনী বন্ডের হিসাব তবু তো পাওয়া গেল যা আগের ব্যবস্থাপনায় অসম্ভব ছিল। প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের গোচরে তা আসছে না, আগেও কি আসত? সুতরাং তুলনায় এই ব্যবস্থা কি উন্নততর নয়? প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জবাবদিহির দায়বদ্ধতা, নির্বাচনী সংস্কার, 'কালো টাকা'র ক্রমবর্ধমান প্রবাহ রোধ করা এবং নগদবিহীন, ডিজিটাল অর্থনীতি জোরদার করা। নির্বাচনী বন্ড ক্রয় ও ভাঙানোর সীমিত সময়-সীমা অর্থ অপব্যবহারের সম্ভাবনা কমায়। এই বন্ড যথাযথভাবে দাতাদের আর্থিক বিবৃতিতে নথিভুক্ত হয় ও প্রদত্ত অনুদান প্রতিফলিত হয়। দাতাদের অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলে হবে, ব্যক্তিগত তথ্য ব্যাংকের কাছে থাকবে। এটা স্বচ্ছতা, জবাবদিহির বাধ্যবাধকতাকে সুনিশ্চিত করবে, এতে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সংস্কার হবে, যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কমিউনিস্টদের রাগের কারণ তারা যথেষ্ট টাকা পাবে না জানে, দলীয় অবস্থান তাদের এতটাই নড়বড়ে আর কংগ্রেস বা অন্যদলগুলি কালো টাকায় তহবিল গড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই তাদের এত জ্বালা।

শীর্ষ আদালতকেই বলতে হবে এর থেকে শ্রেয়তর ব্যবস্থা কী। অভিভাবকত্ব করতে হলে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। পূর্বাবস্থায় ফেরা যাবে না। শীর্ষ আদালত না হয় বলুন একটি ভালো ব্যবস্থা। □

নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পিছনে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাদের জয়যুক্ত করার বিনিময়ে প্রদত্ত পুঁজির শতগুণ অর্থ এবং নির্বাচিত সরকারের থেকে নানা ভাবে সুবিধা আদায় করে নেওয়া অবাধে চলতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই আইনি আঁচ এড়ানোর জন্য অধিকাংশ লেন-দেন চলতো নগদে এবং সেই বিপুল অর্থ থেকে যেত সরকারি হিসেব নিকেশের বাইরে। এইভাবে একটি কালো-টাকা কেন্দ্রিক সমান্তরাল অর্থনীতি দাপিয়ে বেড়াত রাজনীতির আঙিনায়।

বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসে গুজরাটের মিশন লাইফ এক অগ্রণী পদক্ষেপ

সৌমিত্র সেন

১৯৭০ সালে ২২ এপ্রিল মার্কিন সেনেটর গেলার্ড নেলসন ধরিত্রী দিবস প্রচলন করেন। তখন থেকে পৃথিবীর অনেক দেশই এই ধরিত্রী দিবস বা বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। এই দিবস ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক ভাবে পালিত হয়েছে। অনুরূপ আরেকটি উৎসব হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস যা ৫ জুন প্রায় অনেক দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ সাল থেকেই বেশ কিছু সামাজিক সংস্থা ধরিত্রী দিবস সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করে আসছে। সারা যুক্তরাষ্ট্রে হাজার দুয়েক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাজার দশেক বিদ্যালয় এবং অগণিত সামাজিক গোষ্ঠী ধরিত্রী দিবস উদ্‌যাপন করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-সহ সারা পৃথিবীর প্রায় ১২০টি দেশ ২০১৬ সালে প্যারিস চুক্তিতে একটি দিক নির্দেশের জন্য স্বাক্ষর করে। তারপর থেকে অনেক পদযাত্রা, সচেতনতার প্রসার ও প্রচার হয়েছে কিন্তু প্রকৃতির নিধনও হয়েছে সমান তালে। তাই পৃথিবীব্যাপী মিষ্টি জলের হাহাকার, ভূগর্ভস্থ জল স্তরের নিম্নমুখিতা, বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন, কৃষি জমিতে জলের টান, আবার অতি বন্যায় বানভাসি মানুষের মিছিল আজকে বসুন্ধরা দিবসের প্রাক্কালে যেন আমাদেরই ব্যঙ্গ করছে।

কিন্তু আধুনিকতার দৌড়ে নেমে কোথাও কোথাও ভয়াবহ খরা ও বন্যার কবলে মানব জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ধরিত্রী মায়ের ঋণ তো আমরা শোধ করতে পারিনি উপরন্তু আরও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এই সংকটকালে গুজরাটের 'মিশন লাইফ' ভারতের নেতৃত্বে যেন বিশ্বব্যাপী এক জনআন্দোলনের ডাক দিয়েছে। গুজরাটের 'মিশন লাইফ'-এর সূচনা এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ুর সুরক্ষার জন্য দেশের এক অগ্রণী রাজ্যের উদ্যোগী পদক্ষেপ। খালগুলিতে সৌর প্যানেল স্থাপন করা এবং রাজ্যের খরা পীড়িত অঞ্চলগুলির জন্যে জল সংরক্ষণ মিশন লাইফের প্রধান সার্থকতা। একটি প্রচলিত ধারণা যে জলবায়ুর পরিবর্তন শুধুমাত্র নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়। এটি এমন একটি চিন্তা প্রক্রিয়ার উদ্রেক করে যেন এসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা শুধু সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা উপরে ন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা কতটা আন্তরিক প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধানে? মানুষ তার পারপার্শ্বিক জলবায়ুর

পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করছে এবং বিগত এক দশকে অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এটি স্পষ্ট যে জলবায়ুর পরিবর্তন নীতি নির্ধারণজনিত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। মানুষ তাই নিজেরাই বুঝতে পারছে যে পরিবেশে ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায় হিসেবে তাদের অবদান রাখা উচিত।

পুনর্ব্যবহার এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির ধারণা বহু বছর ধরে ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। এ ধরনের অভ্যাস প্রচলিত আছে, যা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে। মিশন লাইফ প্রকৃতির সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রহণ করেছিলেন এবং এটি আজকে আমাদের জীবনধারার একটি অংশ করা যেতে পারে। ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের ভীতির মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ক্ষমতাসম্পন্ন। আমরা বায়ু শক্তিতে চতুর্থ এবং সৌর শক্তিতে পঞ্চম স্থানে আছি। গত ৮ বছরে ভারতের নবায়নয়োগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময়সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমরা পেট্রোলের সঙ্গে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি এবং তাও সময়সীমার ৫ মাস আগে। জাতীয় হাইড্রোজেন মিশনের মাধ্যমে, ভারত একটি পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসের দিকে এগিয়ে গেছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে তাদের নেট জিরোর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

মিশন লাইফ আন্দোলনের উদ্যোগগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উচিত। বিশেষত আমরা কিছু না করেই যখন বলি 'এগিয়ে বাংলা'। ভারতের পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতির জন্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছে মানুষ। আমাদের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে হবে এবং এই অ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের সব প্রদেশে এই চিন্তা ও উদ্যোগ প্রসারিত করতে হবে। □

মুর্শিদাবাদে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলা, আহত ২০-র বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৭ এপ্রিল, বুধবার ভারত জুড়ে রামনবমী মহোৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রা ফের জেহাদিদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরে বিকেলে

রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর বোমা ছোঁড়া হয়। এর সঙ্গে শোভাযাত্রার ওপর পাথর ছোঁড়াও চলতে থাকে। রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর এই আক্রমণের ঘটনায় একজন মহিলা ও দুই শিশু-সহ ২০ জনেরও বেশি গুরুতর আহত হন। আহতদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও অন্য একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শোভাযাত্রায় হামলার পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর হিংসাত্মক ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকার দরুন প্রশাসনের তরফে এলাকায় ব্যাপক সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের তরফে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর আক্রমণের সঙ্গে ওই অঞ্চলের বহু বাড়ি ও দোকানে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে আগের বছরেও রামনবমী উদ্‌যাপনের সময় পশ্চিমবঙ্গে হিংসার ঘটনা ঘটে। ২০২৩ সালে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা, হাওড়ার শিবপুর, হুগলীর রিষড়া ও শ্রীরামপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণ চালানো হয়। এই ঘটনাগুলিতে বহু লোক জখম হন। রামনবমী শোভাযাত্রায় চলা সেই সন্ত্রাসের ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ।

গত ১৭ এপ্রিল শক্তিপুর ছাড়াও মনিকাহার এলাকাতেও পর পর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা মনিকাহার এলাকায় একাধিক বাড়ি ও দোকান লুঠ করে। বাড়ি ও দোকান ঘরগুলিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। শক্তিপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রা চলাকালীন বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে শোভাযাত্রার ওপর পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। শোভাযাত্রাকে নিশানা করে চলে বোমাবাজি। অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই সময় শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রায় যোগদানকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশও কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুঁড়তে থাকে। রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণকারীরা তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ।

রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর এই আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিত মালব্য এই ঘটনার জন্য গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তরফে দেওয়া প্ররোচনামূলক ভাষণকে দায়ী করেছেন। রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণের এই ঘটনা নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে অনবরত প্ররোচনামূলক বক্তৃতার ফলশ্রুতি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রামনবমী শোভাযাত্রার ওপর আক্রমণ রুখতে ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রকাশ্যে হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসের ঘটনায় পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এই জঘন্য, হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে অবিলম্বে এনআইএ তদন্ত দাবি করেছেন।

শোক সংবাদ

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের সদস্য দেবাশিস লাহিড়ীর মাতৃদেবী হাসি রাশি লাহিড়ী গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা, ১ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন হুগলী জেলা সঙ্ঘচালক ডাঃ পঙ্কজ সিংহের সহধর্মিণী সুজাতা সিংহ গত ২১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ২ পুত্র ও ২ পুত্রবধূ ২ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার কালিয়াচকের আলিপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা মালদা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ বিপ্লব স্বর্ণকারের মাতৃদেবী মিনা স্বর্ণকার গত ২২ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছন।